

প্রশ্নোত্তরে জৈনধর্ম

ঃ কাশিমুল্লাহ

মচুল মুস্তাফা

গুরু সাহাবিচ ও মুলী

১০০ ০০০ প্রাচীন

অধ্যাপক ডঃ সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

এম্এ (ডব্লি); পি এইচ ডি (কলিকাতা); পি এইচ ডি (এডিনবুরো)

প্রাকৃত বিদ্যা মনীষী (জে.বি.বি.)

অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

আদাকাট ভীকুঃ মনু

ঃ কুমার

গুরু মতিমাণি

জৈন ভবন

পি ২৫ কলাকার ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০০৭

ক্লেশাত্ত গুণীগুণ প্র

১০০ ০০৮-ভাবনাবিক

সূচীপত্র

১। জৈনধর্ম কাকে বলে?	১
২। জৈন ধর্মের কটি নাম আছে?	২
৩। তীর্থকর শব্দের অর্থ কি?	৩
৪। জৈনধর্মের মূল আদর্শ কি?	৩
৫। মহাবীর স্বামী ও তার বাণী কি?	৩
৬। মহাবীরের বাণী কি?	৪
৭। তীর্থকর, গণধর, মহাবীরের শিষ্য পরম্পরা ও জৈন শলাকা পুরুষ কি?	৭
৮। জৈনধর্ম সম্বন্ধে জানবার উপায় কি? তাদের কি কোন সাহিত্য আছে? কোন ভাষায় রচিত?	১৩
৯। জৈন নমস্কার মন্ত্র কি?	২৪
১০। আচ্ছা, হিন্দুপূজার মত জৈন পূজায়ও কি,	২৫
অপিত্রঃ পবিত্রো বা মন্ত্র আছে?	
১১। আচ্ছা, জৈন নমোক্তার মন্ত্রে, 'অরহস্তাণং', 'অরিহস্তাণং' এবং 'অরুহস্তাণং' পাঠের মধ্যে কোনটা ঠিক?	২৬
১২। জৈন শাস্ত্রে বিশ্বকে কিভাবে দেখেছেন?	৩০
১৩। জৈনেরা কি নিরীশ্বরবাদ?	৩০
১৪। বিশ্বের উর্ধ্বলোকের বিভাগ ও সিদ্ধাশিলা কি?	৩০
১৫। জৈন কালচক্র ও যুগ কল্পনা কি?	৩১
১৬। জৈনমতে বিশ্ববিভাগ কি ধরণের? একটু সবিস্তারে বলবেন?	৩১
১৭। অস্তিকায় শব্দের অর্থ কি?	৪১
১৮। জৈনমতে মৃত্তি পাবার উপায় কি?	৫১
১৯। জৈন জীবন ধারা কি? সাধু-সাধবী ও শ্রাবক-শ্রাবিকার জীবন ধারাই বা কি?	৫১
২০। জৈন সংস্কৃতির মূলধারা কি?	৬৫
২১। জৈন দর্শন সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু বলবেন?	৬৮
২২। শ্রাবক শব্দের অর্থ কি? কয় প্রকার ও কি কি?	৭২
২৩। হিন্দুদের মত জৈনদেরও কি 'চতুরাশ্রম' আছে?	৭৪
২৪। সম্মেথনা মানে কি?	৭৪
২৫। পুদ্রগল কাকে বলে?	৭৪

প্রস্তাবনা

প্রশ়ংসনের জৈনধর্ম বইটি প্রকাশিত হল। বিভিন্ন সময়ে জৈন সংস্কৃতি মূলক পত্রিকা শ্রমণের কৌতুহলী বাস্তালী পাঠক জৈনধর্ম সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশ্ন করেছিলেন, সেগুলোকে শ্রেণীবদ্ধ করে তার একটা যথাযথ উত্তর দেবার চেষ্টা করেছিলাম শ্রমণ পত্রিকায় (পঞ্চবিংশ বর্ষ দ্রষ্টব্য)। ধারাবাহিকভাবে সেগুলো পত্রিকায় বেড়িয়েছিল। সেখান থেকেই পরে গ্রন্থাকারে এই পুস্তিকারণপে প্রকাশিত হল। এর উত্তরগুলো মৎপ্রণীত জয়াচার্যের অনুশাসনাবলী (কলিকাতা ১৯৮২) গ্রন্থের ভূমিকা থেকে পরিবর্জিত, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করে নেওয়া।

পাঠকদের প্রশ্নের উত্তরগুলো যথাযথ শাস্ত্র অবলম্বন করে লেখা। সেজন্য এতে বিভিন্ন গ্রন্থের প্রভৃতি উদ্ধৃতি আছে। নিজের মন থেকে ইচ্ছেমত উত্তর দিয়ে লিখি নি। প্রামাণিক করার চেষ্টা করেছি। আশা করি, এতে পাঠকদের সুবিধে হবে।

পুস্তিকারে এ গ্রন্থ প্রকাশ করার দরুণ জৈন ভবনের পরিচালকদের ধন্যবাদ। শ্রী পবিত্র কুমার ডুগর, শ্রী দিলীপ সিংহনাহটা ও শ্রীমতী লতা বোথরা সকলেই এটিকে বই আকারে প্রকাশ করার জন্য সচেষ্ট হলেন। শ্রীপবিত্র কুমার ডুগর মহাশয় একজন কর্মসূত্র ও বিবেকধারী সম্পাদক। তাঁর প্রোৎসাহে এ বইটি প্রকাশিত হওয়ায় আমি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ। শ্রীদিলীপ সিংহনাহটা জৈন ভবনের পত্রিকা সমূহের কর্ণধার। তাঁর সজাগ দৃষ্টি, পরিশীলিত চিন্তাধারা ও পত্রিকার মানোন্ময়নের প্রচেষ্টা এ বইটির রূপায়নে সাহায্য করেছে। শ্রীমতী লতা বোথরা এই বইটি প্রকাশে সর্বপ্রকার উদ্যোগী হওয়ায় তাঁর নিকট ঝণী। আমি এদের সকলের নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে যদি এ বইটি পাঠক মহলে বিশেষ সমাদৃত হয়, তাহলে কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য সফল ও আমার পরিশ্রম সার্থক। অলম্ব অতিবিস্তরণ। ইতি—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২০শে ডিসেম্বর ১৯৯১।

শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ପାତାଧୀମ ପରିଷକ ମିଳ ଦେଇ ତୁମେ ହୀନ୍ଦୁ ପାତାଧୀମ ପାତାଧୀମ
କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଇ କରିବାର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାତାଧୀମ ପାତାଧୀମ ପାତାଧୀମ
କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ

ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରେ ଜୈନ ଧର୍ମ

୧। ଜୈନ ଧର୍ମ କାକେ ସବୁ ? ଜୈନ ଧର୍ମ କାକେ ସବୁ ? ଜୈନ ଧର୍ମ କାକେ ସବୁ ?
ଜୈନ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆଲୋଚନା କରତେ ହଲେ ପ୍ରଥମେଇ ମନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗେ ଯେ ଜୈନ ବଲତେ
ଆମରା କି ବୁଝି ? ଜୈନ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟଃପତ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟର ମାଧ୍ୟମେ ଏଇ ଉତ୍ତର ପାଓଯା ଯାବେ ।

‘ଜୈନ’ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର
ଉତ୍ତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟେ ନକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଁବେ । ଜି ଧାତୁର ଦୁଟି ଅର୍ଥ । ପ୍ରଥମତଃ ‘ଜୟ
କରା’ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ‘ଅଭିଭବ କରା’ । ଅତେବ ଜିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଁ ‘ଯିନି ଜୟ କରେଛେ’,
‘ଯିନି ପରାଭବ ବା ଅବମାନନା ବା ଅନାଦର କରେଛେ ।’ କି ଜୟ କରେଛେ, ବା କାକେ ଜୟ
କରେଛେ, ଏରାପ ପ୍ରଶ୍ନ କରଲେ ବଲତେ ହେଁ ଯେ ‘ଯିନି ନିଜେର ଆତ୍ମାକେ ଅପରେର ବନ୍ଧନ ହତେ
ଜୟ କରେଛେ’, ଅର୍ଥାଏ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାସ୍ର୍ୟ ପ୍ରଭୃତିର ବନ୍ଧନ ହତେ ଯିନି
ନିଜେକେ ଜୟ କରେଛେ ତିନିଇ ‘ଜିନ’ । ଆବାର ଏଇ ବଲା ଯାଇ ଯେ, ‘ଯିନି କଠୋର ତପସ୍ୟାର
ଦ୍ୱାରା ଜଗତେର ଭୋଗ-ବାସନା-ଲାଲସାକେ ହତାଦର କରେଛେ, ତିନିଓ ‘ଜିନ’ ।’ ସୁତରାଂ
ଆୟସଂୟମପୂର୍ବକ ଯିନି ଇତ୍ତିଯାଦି ନିଗ୍ରହ କରତେ ପେରେଛେ ତିନି ‘ଜିନ’ । ଏ ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରେ
ଜି-ଧାତୁର ଏକଟୁ ବିଶେଷ ସୀମିତ ଅର୍ଥେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଁବେ । ପରବତୀ କାଳେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏକଟୁ
ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରେ । ଜୈନଶାସ୍ତ୍ର ଜିନପଦବାଚ୍ୟ ପୁରୁଷକେ ଆଠାରଟି ଦୋଷ ଥିଲେ—
ମୁକ୍ତ ଥାକତେ ବଲା ହେଁବେ । ସେଣ୍ଟଲୋ ହଲୋ—

ଅନ୍ତରାୟ-ଦାନ-ଲାଭ-ବୀର୍ୟ-ଭୋଗୋପଭୋଗଗା: ।

ହସ୍ୟୋ ରତ୍ୟରତୀ ଭୀତିର୍ଜୁଣ୍ଣା ଶୋକ ଏବଂ ଚ ॥

କାମୋ ମିଥ୍ୟାତ୍ମମ ଅଞ୍ଜାନନିଦ୍ରା ଚାବିରତିଷ୍ଠଥା ।

ରାଗଦ୍ଵେଷଚ ନୋ ଦୋଷାନ୍ତେଷାମ ଅଷ୍ଟାଦଶାପ୍ୟମୀ ॥

ଅର୍ଥାଏ, (୧) ଦାନାଦିପରିଗହଣ, (୨) ବ୍ୟବସାବାନିଜ୍ୟାଦିତେ ଲାଭ, (୩) ବୀର୍ୟ, (୪) ଭୋଗ,
(୫) ଉପଭୋଗ, (୬) ହସ୍ୟ, (୭) ରତ୍ୟ, (୮) ଅରତି, (୯) ଭୀତି, (୧୦) ଜୁଣ୍ଣା,
(୧୧) ଶୋକ, (୧୨) କାମ, (୧୩) ମିଥ୍ୟାଜ୍ଞାନ, (୧୪) ଅଞ୍ଜାନ, (୧୫) ନିଦ୍ରା, (୧୬) ଅବିରତି,
(୧୭) ରାଗ ଓ (୧୮) ଦେବ—ଏଇ ଆଠାରଟି ଦୋଷକେ ଯିନି ପରିହାର କରେଛେ, ତିନିଇ ‘ଜିନ’ ।

এরূপভাবে কালক্রমে অর্থের প্রসার হতে হতে এর অর্থ এরূপ দাঁড়ালো—
 ‘সংসারের ভোগবাসনা হতে মুক্ত হয়ে কঠোর তপস্যার মাধ্যমে যাঁরা অঙ্গীকৃক
 শক্তিসম্পন্ন হয়েছেন, তাঁরাই জিন।’ এ অর্থ-সম্বলিত ‘জিন’ শব্দ হতে ‘জৈন’ শব্দের
 উৎপত্তি হয়েছে। এর অর্থ হলো—জিন মহাপুরুষগণ যে মত প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করে
 গেছেন, সে জ্ঞানলাভার্থ সে মতাবলম্বী ব্যক্তিই জৈন, আর সে মত যাঁরা অবলম্বন
 করেন তাঁদের ধর্মকে ‘জৈনধর্ম’ বলা হয়। তাঁরাই ‘মহাপুরুষ’, তাঁরাই জৈন শাস্ত্রোক্ত
 ‘শ্লাকাপুরুষ’। সাধারণ মানুষ যা করতে পারে না, তাঁরা তাই সম্পাদন করেন। এঁদেরই
 অপর নাম ‘অর্হন्’ বা ‘তীর্থঙ্কর’। সঙ্গী। ক্যাম্প মাস ‘নব্রত্তি’ শীর্ষস্থ চন্দ্রাম ‘নব্রত্তি’

২। জৈন ধর্মের কটি নাম আছে?

জৈনধর্ম আবার বহু নামে পরিচিত। যথা—অর্হন্ ধর্ম, তীর্থঙ্কর ধর্ম, শ্রমণ ধর্ম,
 নির্গুহ ধর্ম, স্যাদ্বাদ ধর্ম ইত্যাদি। এ সমস্ত নামের মধ্যে ‘জৈন ধর্ম’ নামটিই সমধিক
 সমাদ্রিত হয়েছে। এ ধর্মের যাঁরা প্রবক্তা তাঁরা নমস্য, পূজনীয়—এ অর্থেই এর নাম হয়
 ‘অর্হন্ ধর্ম’। আর ‘শ্রম’ অর্থাৎ তপস্যা দ্বারা এঁরা জগৎকে জয় করেছেন বলে এঁরা
 ‘শ্রমণ’ নামেও পরিচিত। অতএব এঁদের প্রবর্তিত ধর্মের নাম শ্রমণ ধর্ম। বৌদ্ধ
 সম্প্রদায়েরও ‘শ্রমণ’ বলা হয়। কিন্তু জৈন আগম শাস্ত্রে বহুবার ভগবান্ মহাবীরকে
 ‘শ্রমণ’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। ‘নির্গুহ-ধর্ম’ বলার কারণ এই যে এঁরা গ্রাহিণু
 অবস্থায় থাকতেন বলে এঁদের প্রবর্তিত ধর্মকে ‘নির্গুহ’ ধর্ম বলা হয়। বৌদ্ধ শাস্ত্রে এই
 ‘নিগংগংহো ধন্মো’ এর উল্লেখ আছে। স্যাদ্বাদ-ধর্ম বহু পরবর্তী কালের। জৈনদর্শনে
 স্যাদ্বাদ একটি অভিনব অবদান। সে সময় এর বহু প্রচলন দেখা যায় বলে এ মতাবলম্বী
 লোকদের ‘স্যাদ্বাদধর্মী’ বলা হত। কিন্তু এ নামগুলোর প্রচার তেমন হয়নি। কারণ জৈন
 নামের যেমন একটা ব্যাপকতা আছে এগুলোর তা ছিল না। এর মধ্যে কেবলমাত্র
 তীর্থঙ্কর নামের কিছু প্রসিদ্ধি আছে। কারণ যে সমস্ত মহাপুরুষগণ, ‘জিন’ বলে খ্যাতি
 লাভ করেছিলেন, তাঁরাই ‘তীর্থঙ্কর বা তীর্থকর’ নামে অভিহিত হয়েছেন।

৩। তীর্থঙ্কর শব্দের অর্থ কি?

তীর্থঙ্কর নামটি ‘ভৱণ করা’ বা ‘পার করা’ অর্থে তৃ ধাতু হতে উৎপন্ন হয়েছে।
 তারপর ‘যিনি তীর্থ করেন’ এই অর্থে তীর্থঙ্কর বা তীর্থকর (তীর্থং করোতি ইতি তীর্থ-
 কৃ + অচ্ (বা খচ্)) তীর্থ শব্দের অনেক অর্থ আছে। যেমন তীর্থ মানে শাস্ত্র। অতএব
 যিনি শাস্ত্র রচনা করেন, তিনি তীর্থকর অর্থাৎ শাস্ত্রকার। তীর্থ শব্দের অন্য আর একটি

অর্থ হচ্ছে ‘সংসার সমুদ্র’। সুতরাং যিনি তীর্থ হতে (অর্থাৎ সংসার সমুদ্র হতে) সাধারণ লোককে পার করে থাকেন তিনিই তীর্থকর। কাশীখণ্ডে সত্য, ক্ষমা প্রভৃতি গুণকে তীর্থ বলে নির্দেশ করা হয়েছে।

সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থং, তীর্থমিদ্বিয়নিগ্রহং
সর্বভূতে দয়া তীর্থং সর্বত্রার্জবমেব চ ॥

দানং তীর্থং, দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থমুচ্যতে।

ব্রহ্মচর্যপরং তীর্থং তীর্থং প্রিয়বাদিতা ॥

জ্ঞানং তীর্থং, ধৃতিস্তীর্থং পুণ্যং তীর্থমুদাহৃতম্।

তীর্থানামপি তত্ত্বীর্থং বিশুদ্ধির্মনসঃ পরা ॥

অর্থাৎ ‘সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সর্বভূতে দয়া, ঝজুতা, দান, দম, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য, মধুরভাষণ, জ্ঞান, ধৈর্য, পুণ্য এবং মনের বিশুদ্ধি তা প্রভৃতি গুণগুলো যিনি পালন করেন, তিনিই তীর্থকর।’

৪। জৈনধর্মের মূল আদর্শ কি?

এ সকল ব্যৃত্তিমূলক আলোচনা হতে এ কথাই সুস্পষ্ট হয় যে জৈনধর্মের মূল আদর্শ হচ্ছে কৃচ্ছুসাধন, কঠোর তপস্যার মাধ্যমে আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়-সংযম ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষ হওয়া, সংযমী পুরুষ হতে হলে সর্বপ্রকার হিংসা হতে মুক্ত হতে হবে। আদের কথাই হলো “মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ”—‘জগতের কোন প্রাণীর প্রতিই হিংসা করা উচিত নয়।’ কারণ “অহিংসা পরমো ধর্মঃ”। ‘অহিংসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম’।

৫। মহাবীর স্বামী ও তার বাণী কি?

মহাবীর স্বামী জৈনধর্মের প্রবর্ধক। শ্রীষ্টপূর্ব পাঁচ বা ছ’ শ বছর পূর্বে বর্ধমান মহাবীরের (ঝীঃ পূঃ ৫৯৯) জন্ম হয়। তাঁর সময়ে ভারতে বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলে বৈদিক যাগযজ্ঞে পশুবধ প্রথার বিশেষ আধিক্য ছিল। মহাবীরের মতে ব্রাহ্মণগণ স্বীয় অভীষ্টপূরণের জন্য যাগযজ্ঞে হিংসামূলক কার্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। এসব একটি মতবাদ তখন জনগণের মধ্যেও বদ্ধমূল হতে আরম্ভ করেছিল। ফলে, হিংসামূলক বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে জনগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সে বেদবিরোধী জনগণের অধিনায়করাপে প্রথমে পার্শ্বনাথ এবং পরে মহাবীর স্বামী ও জিনিস্ত্বনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে জনমত গঠন করতে লাগলেন। এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে তখন ব্রাহ্মণ ধর্ম হতে ক্ষাত্র্য ধর্ম প্রবল ছিল। এ সকল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহাবীর স্বীয় মত স্থাপনে প্রয়াসী হলেন। তখন মহাবীরের সমকক্ষ কেউ ছিল না। মহাবীর বৈদিক সাহিত্য ও তার যাগযজ্ঞ পদ্ধতি

থুব ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন বলে মনে হয়। শাস্ত্র অধিগত মা হলে ক্ষুরধার বুদ্ধি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সৎগে তর্কযুদ্ধে কখনই প্রবৃত্ত হতে পারতেন না। তা ছাড়া বিভিন্ন ঘামে গিয়ে সভাসমিতিতে তিনি যে সমস্ত বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে তাঁর অপূর্ব প্রজ্ঞাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

৬। মহাবীরের বাণী কি?

মহাবীর স্বামী বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার মূল মর্মকথা ছিল ‘আত্মসংযম’। এ সংযম বা চরিত্রকেই জৈন শাস্ত্রে প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে। জৈনশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে প্রাণীর প্রতি প্রাণীর যে হিংসা, অশুভ চিন্তা বা অমঙ্গল কামনা তার মূলে আছে রাগ-দ্বেষাদি। রাগ-দ্বেষাদিই সংসারের মূলভূত কারণ। কখনও শরীর দ্বারা, কখনও মন দ্বারা, আবার কখনও বা বাক্য দ্বারা প্রাণীর প্রতি আমরা হিংসা করে থাকি। অতএব মানুষকে কায়মনোবাক্যের দ্বারা সংযমী হতে হবে। এই ত্রিবিধ সংযম পালন করলে আত্মশুদ্ধি হয়। আর আত্মশুদ্ধি হতেই আত্মোপলক্ষি এবং তা থেকেই মুক্তিলাভ হয়। উপনিষদে বলা হয়েছে জ্ঞানমার্গের দ্বারা মানুষ মুক্তি পেতে পারে। বৌদ্ধশাস্ত্রে বলা হয়েছে ধ্যান-ধারণা, তপস্যার দ্বারা মানুষ দুঃখময় সংসার হতে মুক্তি বা নির্বাণ লাভে সমর্থ হয়। আর মহাবীর বললেন—চরিত্রই হলো মানুষের প্রধান সম্বল। তার মাধ্যমেই মানুষ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির বশবর্তী হয়ে জীব একে অন্যকে কষ্ট দিয়ে থাকে। সুতরাং এগুলো হতে জীবকে মুক্ত থাকতে হবে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছিলেন পরবর্তী কালে তাঁর শিষ্যবৃন্দ সেগুলো লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সেই মহাবীরের লিপিবদ্ধ বাণীই আজ আমাদের নিকট ‘জৈনসাহিত্য’ বলে পরিচিত। এগুলো সব অর্ধমাগধী ভাষাতে রচিত। কারণ মহাবীর বলেছিলেন যে, জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ রাখতে হলো তাদেরই সাধারণ ভাষায় বলতে হবে (ভগবৎ গং আদ্বামাগহীঐ ভাসাএ ধ্যাঃ আইকখই—সমবায়াঙ্গ)। ভগবান् মহাবীরের সে সব উপদেশামৃতকে কেন্দ্র করে কত কাব্য, আখ্যান, উপকথা, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি রচিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। প্রায় ২৫০০ বছর ধরে জৈনগণ নানাভাবে জগতের কল্যাণের জন্য প্রথমে প্রাকৃত ভাষায় পরে সংস্কৃতে ও অপব্রংশে এবং তারও পরে প্রাতীয় প্রাচীন হিন্দী, রাজস্থানী, গুজরাতী, তামিল ও কন্নড় ভাষায় এক বিশাল জৈন সাহিত্য গড়ে তুলেছিলেন।

এ সকল সাহিত্যে জৈনগণ মহাবীরের বাণীকে নামাদিক থেকে নানাভাবে দেখেছেন, ভেবেছেন ও ফলস্বরূপ সাহিত্যাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। গল্পের মাধ্যমে ঘটনার ঘাত-

প্রতিষ্ঠাতে তাঁরা আত্মসংযম ও চিত্তগুণির জন্য উপদেশমূলক গল্প রচনার চেষ্টা করেছেন।

জগতে দুঃখকষ্ট, হিংসা প্রভৃতি হতে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় তার জন্য তিনি পৃথিবীকায়, লোককায়, শীতোষ্ণীয়, সম্যক্ত, লোকসারধৃত, বিমোক্ষ, উপাধানশুণ্ঠ প্রভৃতির উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে জীব দু প্রকারের— মুক্ত ও সংসারী। মুক্তজীব বিদেহ, অতএব ইন্দ্রিয়াদিরহিত। আর সংসারী জীব একেন্দ্রিয় হতে পঞ্চেন্দ্রিয় পর্যন্ত হতে পারে। আমাদের ইন্দ্রিয় মূলতঃ পাঁচটি—চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও অঙ্গ। একেন্দ্রিয় জীবকে ‘স্থাবর’ ও দু হতে পঞ্চেন্দ্রিয় জীবকে ‘এস’ বলা হয়। একেন্দ্রিয় জীব পাঁচ প্রকার। যথা—পৃথিবীকায়, অপ্কায়, তেজস্কায়, বায়ুকায় ও বনস্পতিকায়। এরা ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত ও বোমকে আশ্রয় করে থাকে। পৃথিবীকায়ের মধ্যে হলো মৃত্তিকা, পাষাণ ও নানাবিধি খনিজ পদার্থ। আর জল, শিশির, শিলা প্রভৃতি অপ্কায়ের অন্তর্গত। তেজ, উল্কা, অশনি, প্রভৃতি তেজস্কায়ের অর্তভুক্ত। বায়ুবীয় মণ্ডল ‘বায়ুকায়’ ও যাবতীয় উদ্ধিদ জগৎ ‘বনস্পতিকায়’ বলে বিখ্যাত। মহাবীর স্বামী বলেছেন, যেহেতু পৃথিবীকায় প্রাণী তাদের অব্যক্ত বেদনা প্রকাশে অসমর্থ, অতএব তারা যে বেদনা অনুভব করে না তানয়; তারাও যথেষ্ট কষ্ট ও দুঃখ পায়। যেমন অঙ্গ, মূক ও বধির ব্যক্তিকে নানাভাবে আঘাত করলেও সে কষ্ট প্রকাশে সমর্থ হয় না। তার প্রকাশ করবার ক্ষমতা থাকে না বলে সে কি কষ্ট হতে মুক্ত ? মানুষ যদি প্রশংসা, সম্মান ও পূজা পাবার জন্য, আত্মসুখের জন্য পৃথিবীকায় জীবের প্রতি হিংসা করে, তা হলে তার মুক্তি পাওয়া তো দূরের কথা, সে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা হতেও কখনও নিষ্কৃতি লাভ করতে পারবে না। এভাবে তিনি পৃথিবীকায় প্রাণীদের প্রতি হিংসা থেকে নিবৃত্তি থাকবার জন্য মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন।

‘লোকবিজয়’ শব্দের অর্থ হলো সংসারকে জয় করা। সংসার দু রকমের— দ্রব্য সংসার ও ভাব সংসার। দ্রব্য সংসারের অন্তর্গত হল মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, অর্থ, ধন্য প্রভৃতি, আর দ্রব্য সংসারের প্রতি আসক্তিবশতঃ উৎপন্ন অহক্ষার, ত্রেণাধ, কামনা, বাসনা, মমতা, লোভ, মোহ, মদ, মাঝসর্য প্রভৃতিকে বলা হয় ভাবসংসার। দ্রব্য এবং ভাব সংসারকে জয় করাই হলো ‘লোক-বিজয়’। মহাবীরের মতে দ্রব্য ও ভাব সংসারের বন্তসমূহ অনিত্য। অতএব সংযত আচরণপূর্বক প্রাণিগণের প্রতি হিংসা না করে চিত্তগুণির চেষ্টা করলে আঘাত কল্যাণ সাধিত হবে। ‘শীতোষ্ণীয়’ পর্যায়ে মহাবীর স্বামী বলেছেন যে শীত, উষ্ণতা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতিকে জীবের নির্বিকার চিত্তে উপেক্ষা করা উচিত। কারণ মহাবীরের মতে হিংসাত্মক কার্যের ফলই হলো দুঃখকষ্ট প্রভৃতি। অতএব সংযতাত্মা হয়ে আত্মজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি এগুলোকে উপেক্ষা করে থাকেন। সম্যক্ত্বের দ্বারা মহাবীর বলতে

প্রশ্নোত্তরে জৈনধর্ম

৬

চেয়েছেন যে প্রকৃত তত্ত্বের অর্থাত্ত পদাৰ্থের সম্বৰ্ক জ্ঞান লাভ কৱলে মানুষ পৃথিবীৰ এ সকল প্ৰাণীৰ প্ৰতি কখনও হিংসা বা হিংসামূলক আচৰণ কৱতে পাৰে না। তত্ত্বজ্ঞ, জ্ঞানী ও সংযমী পুৱৰ্ষ এ সকল অবগত হয়ে হিংসা ও রাগ-দ্বেষাদি রহিত হবেন।

‘লোকসার’ প্ৰসঙ্গে মহাবীৰ উপদেশ দিয়েছেন যে মানুষ যদি জ্ঞানবান् ও তত্ত্বজ্ঞ হয়ে আচাৰবান্ন না হন, তাহলে তাৰ পক্ষে চিত্তশুদ্ধি লাভ কৱা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কাৰণ মানুষেৰ আচাৰ শুদ্ধ না হলে সবই ব্যৰ্থ। অতএব রাগ-দ্বেষাদিৰ বশীভৃত না হয়ে সংযম অবলম্বনপূৰ্বক সংসার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ কৱতে হবে। তা হলেই আত্মোন্নতি সম্ভব। ধন-ধান্যৱৰ্ণপা পৱিত্ৰহকে পৱিত্ৰহ কৱতে হবে। কাৰণ পৱিত্ৰহ ত্যাগী জ্ঞানই শুদ্ধ ও যথৰ্থ।

‘ধূত’ পৰ্যায়ে মহাবীৰেৰ বক্তব্য হলো যে কৰ্মক্ষয় ও আসক্তি ত্যাগ না কৱলে ‘সংযম’ বা ‘চৱিত্ৰ’ পালন কৱা সম্ভব নয়। সংযমেৰ বিঘ্নকাৰক যে উপসর্গ (যথা শাৱীৱিক পীড়া, লোভ, ক্ৰেধ, প্ৰভৃতি) সেগুলোকে পৱিত্ৰহ কৱতে হবে। কাৰণ সেগুলো সংযমী, বিনয়ী, বৈৱাগ্যবান্ন হতে মানুষকে দূৰে সৱিয়ে রাখে।

‘বিমোক্ষ’ মার্গে মহাবীৰ বলেছেন যে চিত্তসংযমেৰ একটি প্ৰধান সম্বল হবে ত্যাগ কৱা। কুসঙ্গ, প্ৰলোভন, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা প্ৰভৃতি ত্যাগ কৱতে হবে। মোহমুক্ত পুৱৰ্ষেৰ আচাৰ ব্যবহাৰ অনুসৰণ কৱতে হবে। যিনি রাগ-দ্বেষাদিৰ রূপ মানসিক বন্ধন ও পৱিত্ৰহৰূপ বাহ্য বন্ধন হতে মুক্ত, তিনি নিৰ্গৃহ। সেই নিৰ্গৃহকে মহাপুৱৰ্ষেৰ ন্যায় আচৰণ কৱতে হবে। এ ভাবে দৰ্শন, জ্ঞান ও চৱিত্ৰৱৰ্ণ মুক্তি বা মোক্ষ মার্গেৰ উপদেশ দিয়ে তিনি জীবকে হিংসা কৰ্ম হতে বিৱত থাকতে বলেছেন, রাগ-দ্বেষাদি ও পৱিত্ৰহ ত্যাগ কৱতে বলেছেন এবং ইন্দ্ৰিয় দমন কৱে তপস্যাদিৰ দ্বাৰা আত্মবিকাশে ও তাতে লীন থাকতে বলেছেন। মহাবীৰ স্বামী কেবল উপদেশই দিতেন না, তিনি স্বয়ং সেগুলো পালনও কৱতেন। মহাবীৰেৰ সেই তপশ্চয়াহী পৱিত্ৰতাৰ কালে শিষ্যেৰা লিপিবদ্ধ কৱে ‘উপাধান শ্রত’ নাম দিয়েছেন।

মহাবীৰ যখন রাঢ়দেশে তাঁৰ ধৰ্মত প্ৰচাৰ কৱছিলেন, তখন তাঁকে যে কষ্ট, লাঙ্ছনা ও হিংসাৰ সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা অবণনীয়। তিনি নীৱৰে সে সমস্ত সহ্য কৱে জগতে এক আদৰ্শ স্থাপন কৱে গিয়েছিলেন। ‘আচাৰাঙ্গ সুত্ৰে’ এৰ বৰ্ণনা দেওয়া আছে। মহাবীৰ স্বামী নানাহানে অৱগ কৱতে কৱতে দুৰ্গম রাঢ়দেশেৰ ‘বজ্জভূমি’ (সম্ভবতঃ বাংলাৰ পশ্চিমাঞ্চল) ও ‘শুন্তভূমিতে’ এসে পৌছেছিলেন। সেখানে তিনি বালুকা ও লোষ্ট্রাদিপূৰ্ণ স্থানে শয়ন ও উপবেশন কৱতেন। সেখানকাৰ অধিবাসীৱা তাঁৰ প্ৰতি অত্যাচাৰ কৱতেন। সেখানে তিনি রংক্ষ, শুন্ধ ও স্বল্প পৱিমাণ ভিক্ষা লাভ কৱতেন এবং

সেখানকার লোকেরা ঠাকে কুকুর লেলিয়ে দিতেন। ঠার প্রতি ঠারা রুক্ষ ব্যবহার করতেন। কিন্তু ভগবান् মহাবীর প্রাণিহিংসা ও শরীরের মায়া ত্যাগ করে সবকিছু অত্যাচার, কষ্ট-আঘাত প্রসন্ন-চিত্তে সহ্য করতেন। তিনি রাঢ়দেশের গ্রামে গ্রামে সারাদিন ধরে ঘুরে বেড়াতেন, কিন্তু রাত্রিকালে বিশ্রামের জন্য কোন গ্রামে স্থান পেতেন না। গ্রামবাসিগণ ঠাকে প্রহার করে গ্রামের বাইরে যেতে বলতেন অথবা বের করে দিতেন। কখনও বা ঠারা ঠাকে লাঠি, মুষ্টি বা বল্লমের দ্বারা আঘাত করতেন। কখনও বা চিল, মৃত মানুষের অঙ্গ বা কলসীর কানা নিষ্কেপ করে ঠার শরীর হতে মাংস কেটে নিতেন। কখনও বা কেশ উৎপাটন করতেন অথবা কখনও চোখেতে ধূলো নিষ্কেপ করতেন। কখনও বা উপর হতে নীচে পাতিত করতেন। কিন্তু ভগবান্ মহাবীর মমত্বরহিত ও বিগতস্পৃহ হয়ে সব বাধাবিপত্তি ও দুঃখকষ্ট সহ্য করেছিলেন। বর্মাছাদিত বীরের ন্যায় তিনি ধৈর্য অবলম্বন করে অবিচলিত চিত্তে সমস্ত সংকট বাধাবিপত্তি সহ্য করে স্বীয় লক্ষ্য পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এ ভাবে হিংসারহিত আত্মসংযমী হয়ে ভোগবাসনা, লালসাদিতে বিগতস্পৃহ হয়ে রাগদ্বেষকে জয় করে ভগবান্ মহাবীর স্বীয় ধর্মত প্রচার করেছিলেন।

জৈনধর্মের মহান् আদর্শ এই অহিংসায়, কৃচ্ছসাধনে, কঠোর তপস্যায় ও ইন্দ্রিয় দমনপূর্বক আত্মসংযমে। জৈনধর্ম পিতৃহৃদয়ের পরিচায়ক—এখানে কঠোর শাসনের মাধ্যমে সংসার যাত্রা নির্বাহ করতে হয়। বৌদ্ধধর্মের সংগে মাতৃহৃদয়ের তুলনা করা যেতে পারে। সেখানে শাসন আছে, আবার দয়াও আছে। পিতৃহৃদয়ে ও মাতৃহৃদয়ে যে পার্থক্য জৈন ও বৌদ্ধধর্মেও সেই পার্থক্য। আচারের দিক হতে, পালনের দিক হতে ও মানবতার দিক হতে জৈনধর্ম অনেক উচ্চস্তরের। জৈনধর্মের মূলতত্ত্ব এর মধ্যেই নিহিত আছে।

৭। তীর্থকর, গণধর, মহাবীরের শিষ্য পরম্পরা ও জৈন শ্লাকাপুরুষ কি?

জৈন সাধু-জীবন-বৃত্তান্ত-শাস্ত্রে (Jaina Hagiology) ১৬৯ (=৬৩+১০৬) জন মহাপুরুষকে বিশেষ উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে। এঁদের জীবন বৃত্তান্ত বা আদর্শ নানাভাবে আলোচিত ও স্তুত হয়েছে। এঁরা হলেন—

৬৩ জন শ্লাকা পুরুষ ও

১০৬ জন স্মরণীয় মহাপুরুষ।

আধ্যাত্মিক সাধনায় মুক্ত ৬৩ জন শ্লাকা পুরুষ হলেন—

২৪ জন তীর্থকর

১২ চক্রবর্তী

১৯ বাসুদেব (বা নারায়ণ) স্মাচতীচ (৪)

৯ অতিবাসুদেব (বা অতিনারায়ণ)

৯ বলদেব (বা বলভদ্র)।

আর ১০৬ জন স্মরণীয় মহাপুরুষ হলেন—

মানবীক্ষিকী । মানবীক্ষিকী নাম ছিলো ৯ নারদ

মি ১০৬ ক্ষেত্র মত্তুনি ছিলো ১১ রূদ্র

মানবীক্ষিকী তথ্য কৃতী ছিলো ১২ কামদেব

মি ১০৬ ক্ষেত্র মত্তুনি ছিলো ১৩ তীর্থক্ষর পিতা

মি ১০৬ ক্ষেত্র মত্তুনি ছিলো ১৪ তীর্থক্ষর মাতা

অন্ত মত্তুনি ছিলো ১৫ কুলকর।

মাত্র মত্তুনি ছিলো ১৬ এ ছাড়া, ৪৪ জনের মধ্যে হলেন—

১১ গণধর

৩৩ মহাবীরের শিষ্য

নীচে এন্দের নাম দেওয়া হচ্ছে।

(ক) তেষ্টি জন শলাকা পুরুষ

(১) ২৪ তীর্থক্ষর— (১) আদিনাথ বা ঝৰত বা বৃষত, (২) অজিত, (৩)

শংভব বা সংভব, (৪) অভিনন্দন, (৫) সুমতি, (৬)

পদ্মপ্রভ, (৭) সুপার্ষ, (৮) চন্দ্রপ্রভ, (৯) পুত্পন্দন বা

সুবিধি, (১০) শীতল, (১১) শ্রেয়াৎস, (১২) বাসুপূজ্য,

(১৩) বিমল, (১৪) অনন্ত, (১৫) ধর্ম, (১৬) শান্তি,

(১৭) কৃষ্ণ, (১৮) অর, (১৯) মল্লি, (২০) সুব্রত, (২১)

নমি (২২) অরিষ্ট নেমি, (২৩) পার্বনাথ, (২৪) মহাবীর।

(২) ১২ চক্রবর্তী—

(১) ভরত, (২) সগর, (৩) মঘবন্ত, (৪) সনৎকুমার,

(৫) শান্তিনাথ (৬) কৃষ্ণনাথ (৭) অরনাথ (৮) সুভৌর

বা সুভূম, (৯) পদ্মনাভ, (১০) হরিষেণ, (১১) জয় বা

জয়সেন (১২) ব্ৰহ্মনন্দ।

(৩) ৯ বাসুদেব—

(১) ত্রিপুষ্ঠ, (২) দ্বিপুষ্ঠ, (৩) স্বয়ংত্ব, (৪) পুরুষোত্তম,

(৫) পুরুষসিংহ, (৬) (পুরুষ) পুণ্ডৰীক, (৭) দন্তদেব,

(৮) নারায়ণ (বা লক্ষ্মণ), (৯) কৃষ্ণ।

(৪) ৯ অতিবাসুদেব—

(১) অশ্বগ্রীব, (২) তারক, (৩) মেরক (বা নরক) (৪)

প্রশ্নোত্তরে জৈনধর্ম

৯

(৩) প্রাচী (৪) পাণি (৫) মধুকৈটড়, (৬) বলি, (৭) প্রহৃদ, (৮) রাবণ,
(৯) জরাসন্ধ বা মগধেশ্বর।

(৫) ৯ বলদেব— (১) অচল, (২) জিয়, (৩) ভদ্র (ধর্মপ্রভ) (৪) সুপ্রভ,
(৫) সুদর্শন, (৬) আনন্দ (বা নন্দী) (৭) নন্দন (বা
(৮) নন্দমিত্র), (৯) পদ্ম, (১০) রাম (বলরাম বা রামচন্দ্র)

(৬) একশ ছ'জন স্মরণীয় মহাপুরুষ

(১) ভীম, (২) মহাভীম, (৩) রুদ্র, (৪) মহারুদ্র, (৫)
কাল, (৬) মহাকাল, (৭) দুর্মুখ, (৮) নরকমুখ, (৯)
অধোমুখ।

(৭) ১১ রুদ্র—

(১) ভীমবলি, (২) জিতশক্ত, (৩) রুদ্র (৪) বিশ্বানল,
(৫) সুপ্রতিষ্ঠ, (৬) অচল, (৭) পূরণীক, (৮) অজিত
(৯) মতীয় গীত্যাঃ (৩) ধর, (৯) জিতনাভি, (১০) পীঠ, (১১) সাত্যকি।

(৮) ২৪ কামদেব— (১) বাহবলি, (২) প্রজাপতি, (৩) শ্রীধর, (৪) দর্শনভদ্র,
(৫) প্রসেনচন্দ্র, (৬) চন্দ্ৰবৰ্ণ, (৭) অগ্নিযুক্ত, (৮)

সনৎকুমার, (৯) বৎসরাজ, (১০) কনকপ্রভ, (১১) মেঘ
প্রভ, (১২) শাস্তিনাথ, (১৩) কৃষ্ণনাথ, (১৪) অরহনাথ
(১৫) বিজয়রাজ, (১৬) শ্রীচন্দ্র, (১৭) নলরাজ, (১৮)
হনুমান, (১৯) বলিরাজ, (২০) যাসুদেব, (২১) প্রদূষন,
(২২) নাগকুমার, (২৩) জিবঘৰ, (২৪) জমুস্বামী।

(৯) ২৪ তীর্থকর পিতা—

(১) নাভিরাজ, (২) জিতশক্ত, (৩) জিতারি, (৪) সংবর,
(৫) মেঘপ্রভ, (৬) ধরণ (বা শ্রীধর), (৭) সুপ্রতিষ্ঠ (বা
প্রতিষ্ঠ) (৮) মহাসেন, (৯) সুগ্রীব (বা সুপ্রিয়), (১০)
দৃঢ়রথ, (১১) বিষ্ণু, (১২) বাসুপূজ্য, (১৩) কৃতবর্মণ (১৪)
সিংহসেন, (১৫) ভানু (১৬) বিশ্বসেন, (১৭) সূর্য, (১৮)
সুদর্শন, (১৯) কৃষ্ণ, (২০) সুমিত্র, (২১) বিজয়, (২২)
সমুদ্রবিজয়, (২৩) অশ্বসেন (২৪) সিদ্ধার্থ।

(১০) ২৪ তীর্থকর মাতা—

(১) মরণদেবী, (২) বিজয়াদেবী, (৩) সেনা, (৪)
সিদ্ধার্থা, (৫) সুমঙ্গলা, (৬) সুসীমা, (৭) পৃথিবী, (৮)

(৭) ক্ষমতা, (৮) সুস্থিরতা, (৯) লক্ষণা, (১০) রামা, (১১) সুনন্দা, (১২) বিষ্ণুত্বা, (১৩) বিজয়া, (১৪) সুরম্যা, (১৫) সুরতা, (১৬) অচিরা, (১৭) শ্রীদেবী, (১৮) মিত্রা, (১৯) রক্ষিতা (বা প্রভাবতী), (২০) পদ্মাবতী, (২১) বপ্তা (বা বিপ্তা), (২২) শিবাদেবী, (২৩) বামা, (২৪) প্রিয়কারিণী বা ত্রিশলা।

(১১) ১৪ কুলকর—

(১) প্রতিস্থাতি, (২) সম্মতি, (৩) ক্ষেমকর, (৪) ক্ষেমন্ত, (৫) সীমকর, (৬) সীমন্ত, (৭) বিমলবাহন, (৮) চক্রশান্ত, (৯) যশস্বিন, (১০) অভিচন্দ্র, (১১) চন্দ্রাভ, (১২) মরণদেব, (১৩) প্রসেনচন্দ্র, (১৪) নাভিনরেন্দ্র।

(গ) গণধর ও মহাবীরের শিষ্যপরম্পরা

(১২) ১১ জন গণধর—(১) ইন্দ্ৰভূতি, (২) অগ্নিভূতি, (৩) বাযুভূতি গৌতম (৪) আর্য্যভূতি, (৫) সুধর্ম, (৬) মণ্ডিত, (৭) মৌর্যপুত্র, (৮) অচলভাতা, (৯) মেতার্য, (১০) প্রভাস

(১৩) ৩৩ শিষ্যপরম্পরা ও বীর নির্বাণের পর কালগণনা

৩ কেবলী—

(১) গৌতম	১২	
(২) সুধর্ম বা লোহার্য	১২	=৬২ =৪৬৫ খ্রীঃ পূর্বাদ
(৩) জমু	৩৮	

৫ শ্রতকেবলী—

(৪) বিষুনেন্দী—	১৪	
(৫) নন্দিমিত্র—	১৬	
(৬) অপরাজিত—	২২	=১০০=৩৬৫ খ্রীঃ পূর্বাদ
(৭) গোবৰ্ধন—	১৯	
(৮) তত্ত্বাত্ম—	২১	

১১ দশপুরী

(৯) বিশাখাচার্য—	১০	
(১০) প্রোষ্ঠিল—	১৯	
(১১) ক্ষত্রিয়—	১৭	=১৮১ (বা ১৮৩)=১৮৪ (বা
(১২) জয়সেন—	২১	১৮৬) খ্রীষ্টপূর্বাদ

(১৩) নাগসেন—	১৮	চূড়ান্ত পুরাণে বলা হয়েছে কৃষ্ণের অন্তর্ভুক্ত মৃত্যুবর্তু কর্তৃত মৃত্যু।
(১৪) সিদ্ধার্থ—	১৭	চূড়ান্ত পুরাণে বলা হয়েছে কৃষ্ণের অন্তর্ভুক্ত মৃত্যুবর্তু কর্তৃত মৃত্যু।
(১৫) ধৃতিষ্ঠেণ—	১৮	চূড়ান্ত পুরাণে বলা হয়েছে কৃষ্ণের অন্তর্ভুক্ত মৃত্যুবর্তু কর্তৃত মৃত্যু।
(১৬) বিজয়—	১৩	চূড়ান্ত পুরাণে বলা হয়েছে কৃষ্ণের অন্তর্ভুক্ত মৃত্যুবর্তু কর্তৃত মৃত্যু।
(১৭) বুদ্ধিল—	২০	চূড়ান্ত পুরাণে বলা হয়েছে কৃষ্ণের অন্তর্ভুক্ত মৃত্যুবর্তু কর্তৃত মৃত্যু।
(১৮) গঙ্গদেব—	১৪	চূড়ান্ত পুরাণে বলা হয়েছে কৃষ্ণের অন্তর্ভুক্ত মৃত্যুবর্তু কর্তৃত মৃত্যু।
(১৯) ধর্মসেন—	১৪	চূড়ান্ত পুরাণে বলা হয়েছে কৃষ্ণের অন্তর্ভুক্ত মৃত্যুবর্তু কর্তৃত মৃত্যু।
	(বা ১৬)	চূড়ান্ত পুরাণে বলা হয়েছে কৃষ্ণের অন্তর্ভুক্ত মৃত্যুবর্তু কর্তৃত মৃত্যু।
৫ একাদশ অঙ্গধারী—	(২০) নক্ষত্র—	১৮
	(২১) জয়পাল—	২০
	(২২) পাঞ্চ—	৩৯ = ১২৩ - ৬১ (বা ৬৩) শ্রীষ্ট পূর্বাদ।
	(২৩) ধ্রুবসেন—	১৪
	(২৪) কংস—	৩২
৪ আচারাঙ্গধারী—	(২৫) সুভদ্র—	৬.
	(২৬) যশোভদ্র—	১৮
	(২৭) যশোবাহ—	২৩ = ১৯ (বা ১৭) = ৩৮
	(২৮) লোহার্য—	৫২ (বা ৩৬) শ্রীষ্টাদ
		(বা ৫০)
১ অঙ্গধারী—	(২৯) অর্হন্তলি—	২৮
	(৩০) মাঘনন্দি—	২১
	(৩১) ধরসেন—	১৯ = ১১৮ = ১৫৬ শ্রীষ্টাদ
	(৩২) পুষ্পদন্ত—	৩০ যাত্র পাইলি ছান্দুল চূড়ান্ত পুরাণে
	(৩৩) ভূতবলি—	২০ যাত্র পাইলি ছান্দুল (৩)
		সর্বসাকল্যে = ৬৮৩ বছর (= ১৫৬ শ্রীষ্টাদ)

প্রাকৃত পট্টাবলী নন্দি-আন্নায়ের মত অনুসারে উপরের কাল গণনা করা হয়েছে।
লোহার্য বা সুধর্ম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রণিধানযোগ্য— চার্চি পায়মিন্ডে ও আওঁ
তেণ বি লোহজ্জস্য লোহজ্জেণ য সুধম্বণামেণ।
গণধর সুধম্বণা খলু জংবুণামস নিদিত্তঠঁ।
এখানে স্মরণীয় যে এগারজন গণধরের মধ্যে ইন্দ্ৰভূতি গৌতম ও আর্য সুধর্ম স্বামী

ছাড়া সকলেই মহাবীরের জীবিতকালেই মুক্তিলাভ করেছিলেন। মহাবীরের নির্বাণ লাভের পর পঞ্চম গণধর সুধর্ম স্বামী নির্গত সংঘের নেতা হয়েছিলেন। তাঁর পর থেকে সংঘের নেতৃত্বের ধারা এন্সপ ছিল।

পঞ্চম গণধর সুধর্ম স্বামী—



নেতৃত্বকাল ২০ বছর

তাঁর প্রধান শিষ্য আর্য জসুস্বামী—



" " 88 "

জসুর শিষ্য আর্য প্রভব—



" " 11 "

প্রভবের শিষ্য আর্য শয়ন্ত্রব—



" " 23 "

শয়ন্ত্রবের শিষ্য আর্য যশোভদ্র—



" " 50 "

যশোভদ্রের শিষ্য আর্য সন্তুতবিজয়—



" " 8 "

সন্তুতের শিষ্য আর্য ভদ্রবাহ—



" " 18 "

ভদ্রবাহ শেষ শ্রতকেবলী। চৌদ্দ বছর সংঘের নেতৃত্ব করে মহাবীরের নির্বাণের ১৭০ বছর পর পরলোকপ্রাপ্ত হন। ভদ্রবাহুর অনেক শিষ্য ছিল। বাহ্যিকভাবে এস্তলে তাঁদের নাম পরিত্যক্ত হলো।

৩. মহাবীরের নির্বাণ কাল :

- [১] পার্শ্বনাথের নির্বাণ (৭৭৬ খ্রীঃ পূঃ) লাভের ২৫০ বছর পর মহাবীরের নির্বাণ লাভ হয়।
- [২] মহাবীরের জন্ম ও নির্বাণ লাভ হয়।

(ক) শ্বেতাম্বর মতে ৫৯৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে জন্ম — ৫২৭ খ্রীঃ পূঃ নির্বাণ

(খ) দিগম্বর মতে ৬৫৯ খ্রীঃ পূঃ — ৫৮৭ " " "

(গ) জেকবী মতে ৫৪৯-৮৮ খ্রীঃ পূঃ নির্বাণ — ৪৭৭-৭৬ খ্রীঃ পূঃ

[৩] মহাবীরের জীবিত কাল — ৭২ বছর।

পুরাণ পুরাণ পুরাণ পুরাণ পুরাণ পুরাণ পুরাণ পুরাণ পুরাণ

পুরাণ পুরাণ পুরাণ পুরাণ পুরাণ পুরাণ পুরাণ পুরাণ পুরাণ

পুরাণ পুরাণ পুরাণ পুরাণ পুরাণ পুরাণ পুরাণ পুরাণ পুরাণ

৮। জৈনধর্ম সম্বন্ধে জানবার উপায় কি? তাদের কি কোন সাহিত্য আছে? কোন ভাষার রচিত?

জৈন ধর্ম সম্বন্ধে জানবার উপায় হলো জৈনসাহিত্যের অধ্যয়ন। জৈনদেরও সাহিত্য আছে এবং তাহা বিশাল ও ব্যাপক। জৈন সাহিত্য সাধারণতঃ সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, প্রাচীন গুজরাতী, রাজস্থানী ও হিন্দী, কম্বড় ও তামিল ভাষায় রচিত। সুতরাং জৈন ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষভাবে ব্যৃৎপত্তি লাভ করতে হলে এ সমস্ত ভাষায় রচিত সাহিত্য পাঠ করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু জৈনধর্মের উৎপত্তি, প্রসার ও প্রচারের পক্ষে প্রাকৃত ভাষা আদি স্থান অধিকার করায় বর্তমান অংশে কেবল প্রাকৃত জৈন সাহিত্যের একটু পরিচয় প্রদান করা বাঞ্ছনীয়।

১ জৈন আগম সাহিত্য

প্রাকৃত সাহিত্য মূলতঃ জৈন সম্প্রদায় কর্তৃক পরিপূষ্ট ও পরিবর্ধিত। জৈনের লোকেরা খুব অন্নই প্রাকৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। সেজন্য জৈনদের ধর্ম বা আগম গ্রন্থেই প্রাকৃত সাহিত্যের প্রথম পরিচয় পেয়ে থাকি। মহাবীর মুখ-নিঃস্ত মধুর বাণী তাঁর শিষ্য ও গণধরগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ করার ফলে, এই ‘জৈন আগম সাহিত্যের’ উৎপত্তি হয়েছে। এই জৈন সাহিত্যকে সাধারণতঃ ‘সিদ্ধান্ত বা আগম’ বলা হয়। এর সংগ্রহকাল সম্ভবতঃ খ্রীষ্টাব্দ পঞ্চম শতকে। কারও মতে তারও পূর্বে, কারও মতে বা তারও পরে।

২ জৈন আগম সাহিত্যের উৎপত্তি

শ্঵েতাম্বর জৈনদের মতে শেষ তীর্থকর মহাবীরের নির্বাণ লাভের (খ্রীঃ পৃঃ ৫২৭ অন্দে) প্রায় দু শতাব্দী পরে মগধাধিপতি মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (খ্রীঃ পৃঃ ৩১৮-১৭ অন্দে) মগধদেশে দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষব্যাপী এক দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। তাতে চতুর্দশ পূর্ববিদ্যু স্থানের ভদ্রবাহুর অধিনায়ককে একদল জৈন সাধু দক্ষিণ ভারতের কর্ণটি প্রদেশে আশ্রয় প্রাপ্ত করেছিলেন। অপর আর এক দল মগধদেশেই চতুর্দশ পূর্ববিদ্যু স্থূলভদ্রের অধিনায়ককে রয়ে গেলেন। দুর্ভিক্ষের শেষ বর্ষে ভদ্রবাহুর অনুপস্থিতিতে স্থূলভদ্র পাটলিপুত্র নগরে এক সভা আহ্বান করেন। সেই সভায় ‘চতুর্দশ পূর্ব’ হতে একাদশ অংগ গ্রন্থ ও ‘দৃষ্টিবাদ’ রচিত হলো। দ্বাদশবর্ষ অতীত হলে পর, যখন ভদ্রবাহু দলসহ মগধে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তিনি বস্ত্র পরিহিত মগধস্থিত দল এবং বিবস্ত্র কর্ণটস্থিত দলের মধ্যে প্রভৃত পার্থক্য প্রত্যক্ষ করলেন এবং মগধস্থিত দলের মতবাদ ও আচার পদ্ধতি মহাবীর পদ্ধার প্রতিকূল বিবেচিত হওয়ায় তা অস্বীকার করলেন। ফলে, ‘শ্঵েতাম্বর’ ও ‘দিগম্বর’ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হলো খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে। এভাবে এই সম্প্রদায়ের

উৎপত্তি হলে পর (সম্বতঃ ৪৫৪ বা ৪৬৭ খ্রীঃ) যখন স্তুলভদ্র পরিকল্পিত শ্বেতাস্বর জৈনদের অঙ্গস্থাদি লোপ পেয়ে যাচ্ছিল, তখন গুজরাটের বলভী নগরীতে দেবধিগণি ক্ষমাশ্রমণের নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার সভা আহুত হলো। দৃষ্টিবাদ ইতিপূর্বেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং তা বাদে অপরাপর অঙ্গস্থ সমুহের পুনর্বার সংস্কার করা হলো। সেই সংস্কৃত অঙ্গস্থাদিই বর্তমান কাল পর্যন্ত চলে এসেছে। কিন্তু জৈনগণ শ্বেতাস্বর ও দিগন্বর সম্প্রদায়ে বিভক্ত হওয়ায় তাদের ধর্মগ্রন্থের নামও আলাদা হলো, যদিও দুইই মহাবীরের বাণী সংকলনের ফলে উৎপত্তি।

৩ জৈন সাহিত্য সঞ্চলন ও সভা

৫২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মহাবীরের নির্বাণ লাভ হয়। তখন থেকে ৬৮৩ বছর (অর্থাৎ ১৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত মহাবীর প্রবর্তিত একাদশ অঙ্গ ও চতুর্দশ পূর্ব যথারীতি প্রচলিত ছিল।

৪৬৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দঃ মহাবীরের নির্বাণলাভের ৬২ বছর পর পর্যন্ত ত্রিকেবলী গৌতম, সুধর্ম ও জন্মু স্বামী মহাবীরের বাণী প্রচার করে এসেছিলেন।

৩৬৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দঃ তার ১০০ বছর পর পর্যন্ত পাঁচ শ্রতকেবলী বিশুনন্দী, নন্দিমিত্র, অপরাজিত, গোবর্ধন ও ভদ্রবাহ যথারীতি সে ধারা বহন করে এসেছিলেন।

৪৭ খ্রীষ্টপূর্ব শতকে শ্বেতাস্বর ও দিগন্বর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। তখন এদের মধ্যে আগম ও আচারগত সামান্য মতভেদ দেখা দিতে আরম্ভ করে।

৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পাটলিপুত্রে প্রথম সভা হয় এবং তাতে ৬২টি আগম গ্রন্থ সঞ্চলিত হয়েছিল।

৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দিগন্বর সম্প্রদায়ের আগম গ্রন্থ লিখিত হয়।

৮০ খ্রীষ্টাব্দঃ মহাবীরের নির্বাণ লাভের ৬০৯ বছর পরে (৮০ খ্রীষ্টাব্দে) শ্বেতাস্বর ও দিগন্বর সম্প্রদায়ের বিভাগ স্পষ্ট ও পূর্ণরূপে দেখা দিল। সে বিভাগের ধারা আজ পর্যন্তও চলে আসছে।

১৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দশপূর্ববিদ, একাদশ অঙ্গবিদ, চতুরঙ্গবিদ, ও এক অঙ্গবিদ শিষ্যগণ পূর্বধারা অনুসরণ করে আসছিলেন। কিন্তু এর পর আগম গ্রন্থের বিলুপ্তি দেখা দিতে আরম্ভ করলো। চতুর্দশপূর্ব ইতিপূর্বেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। দ্বাদশ অঙ্গ 'দৃষ্টিবাদ' ও তখন লুপ্ত।

৪৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সভার প্রায় ৮০০ বছর পরে দেবধিগণি ক্ষমাশ্রমণের নেতৃত্বে গুজরাটের বলভী নগরীতে দ্বিতীয়বার আর এক সভা আহুত হয়। তাতে ৮৪টি গ্রন্থ সঞ্চলিত হয়। সে সর গ্রন্থ আমাদের নিকট যথারীতি এসে পৌছেয় নি।

তার থেকে মাত্র ৪৫টি গ্রন্থ আজ উপলব্ধ। সে ৪৫টি গ্রন্থই আজ শ্বেতাম্বর জৈনাগম বলে প্রসিদ্ধ।

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ ৪ এরপর ৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্করাচার্যের প্রভাবে জৈন আগম গ্রন্থ বিশ্বৃতির গর্ভে তলিয়ে যায় এবং মহীশূরের শ্রবণবেলগোলায়, রাজস্থানের মেবার শহরে এবং নেপালে জৈনগ্রন্থ আঘাগোপন করে এবং সেখান থেকে পরে আবার প্রসার লাভ করতে থাকে।

চতুর্থ-১২শ শতাব্দী

অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দাশনিক তত্ত্বের তর্কের যুগ। কুমারিলত্ত স্বীয় হিন্দুমত স্থাপনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে লাগলেন। তাতে জৈনগণ সাড়া দিলেন। সমন্বিত ও অকলক তর্কের চেতু তুললেন। শঙ্করাচার্য বেদান্ত, আর প্রভাচন্দ্র ও বিদ্যানন্দও জৈন মতবাদ প্রচার করতে লাগলেন। তার পর থেকে শীলাঙ্ক বা শীলাচার্য, জিনসেন সিদ্ধার্থ, অমিতগতি, নেমিচন্দ্র, শান্তিসূরি, দেবেন্দ্রগণি, অভয়দেবসূরি ও হেমচন্দ্র (১০৮৮-১১৭২ খ্রীঃ) সকলই জৈন দর্শনের মতবাদ স্থাপনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে লাগলেন। এর ফলে হিন্দু ও জৈন মতবাদ পাশাপাশি অবস্থান করতে লাগলো। সেই ধারা আজও সমানে চলে আসছে।

১৪৫২ খ্রীষ্টাব্দে জৈনদের মধ্যে লুক্ষ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হলো। তারা মূর্তি পূজার বিরোধী।

১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থানকবাসী বা চুণিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে জৈন শ্বেতাম্বর তেরাপষ্ঠী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি।

৪ দিগম্বর আগম গ্রন্থ

শ্বেতাম্বর জৈনদের মতে দ্বাদশ অঙ্গ গ্রন্থ ‘দৃষ্টিবাদ’ লুপ্ত; আর দিগম্বরেরা বলেন, ‘দৃষ্টিবাদ’ তাঁদের দ্বারা রক্ষিত এবং এই দিগম্বর সম্প্রদায়গণ কর্তৃক রক্ষিত গ্রন্থই বর্তমানে ‘দিগম্বর জৈনাগম’ নামে বিখ্যাত। সে যাই হোক, শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর গ্রন্থনিচয়ের সংমিশ্রণে জৈনদের আগমগ্রন্থ পরিস্পরের পরিপূরক ও সংপূরক হয়েছে।

দিগম্বর সম্প্রদায়ের মতে দৃষ্টিবাদ পাঁচভাগে বিভক্ত :—

(১) পরিকর্ম (২) সূত্র, (৩) প্রথমানুযোগ, (৪) পূর্বগত এবং (৫) চূর্ণিকা। এদের মধ্যে ‘পূর্বগত’ ব্যতীত অপর চারিটির বিষয় কিছু জানা যায় না। পূর্বগত আবার চৌদ্দটি উপবিভাগে বিশ্বায়ীকৃত। যথা— (১) উৎপাদপূর্ব, (২) অগ্রায়ণীয়, (৩) বীর্যপ্রবাদ, (৪) অস্তি-নাস্তি প্রবাদ, (৫) জ্ঞান-প্রবাদ, (৬) সত্যপ্রবাদ, (৭) আঘাতপ্রবাদ, (৮) কর্মপ্রবাদ,

- (৯) প্রত্যাখ্যান (১০) বিদ্যানুপ্রবাদ, (১১) কল্যাণপ্রবাদ, (১২) আণবায়,
 (১৩) ক্রিয়াবিশাল, এবং (১৪) লোকবিন্দুসার।

অধুনা উক্ত বিষয়সমূহ যথাযথভাবে আমাদের নিকট উপস্থিত না হলেও তাদের
 প্রতিপাদ্য বিষয় নিম্নলিখিত গ্রন্থ থেকে জানতে পারা যায়।

ষট্খণ্ডগম

পুষ্পদন্ত-ভূতবলি প্রণীত ষট্খণ্ডগম একটি প্রাচীন দিগন্বর জৈন ধর্মগ্রন্থ। ইহা
 (জৈন) শৌরসেনী ভাষায় রচিত; মধ্যে মধ্যে অর্ধমাগধী ও মাগধী ভাষার প্রভাব দৃষ্ট
 হয়। এর রচনাকাল সন্তুষ্টিঃ প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে। গ্রন্থখানি দর্শন বিষয়ক এবং
 কর্মপদ্ধতি দ্বারা প্রভাবাবিত। ইহা ছ'খণ্ডে বিভক্তঃ— যথা—জীবস্থান, ক্ষুণ্ণকবন্ধ,
 বন্ধস্বামিত্ববিষয়, বেদনা, বর্গনা ও মহাবন্ধ। পুষ্পদন্ত প্রথম ৭৭টি সূত্র রচনা করেন এবং
 তারপরে ভূতবলি অবশিষ্টাংশ রচনা করেন। সর্বসাকলে ৬০০০ সূত্র দৃষ্ট হয়। বীরসেন
 কর্তৃক বিরচিত এর ‘ধ্বলা’ নাম্বী টীকা এরূপ প্রসিদ্ধ যে গ্রন্থখানি ‘ধ্বলা’ নামেও বিখ্যাত।

গুণধরাচার্য কর্তৃক বিরচিত ‘ক্ষয়পাহড়’ আর একটি দিগন্বর জৈন ধর্মগ্রন্থ। এর
 রচনাকাল আনুমানিক দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে। এই গ্রন্থে ক্রোধাদি কষায়ের
 রাগব্রেষ্যাদিরূপে পরিগতি, তাদের প্রকৃতি, অবস্থান, অনুভাগ, প্রদেশগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি
 বিষয়ের আলোচনা আছে। এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম ‘পেজ্জদোস-পাহড়’ (পেজ্জ=প্রেয়স,
 রাগ; দোস=দ্বেষ এবং পাহড়=প্রাড়ত)। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, এ গ্রন্থে ক্রোধাদি
 চারটি বা হাস্যাদি নাট্টি রাগ ব্রেষ্যাদির কথা উক্ত হওয়ায় এ গ্রন্থের নাম ‘পেজ্জদোস-
 পাহড়’। বীরসেনাচার্য এর ‘জয়ধ্বলা’ নাম্বী টীকা এবং বৃষভাচার্য এর চূর্ণসূত্রের প্রণেতা।
 উক্ত গ্রন্থখানি ‘জয়ধ্বলা’ নামেও বিখ্যাত।

মহাবন্ধ

ষট্খণ্ডগমকে যে ছ'ভাগে ভাগ করা হয়, তার অন্তিম ভাগের নাম ‘মহাবন্ধ’। সেই
 মহাবন্ধ এরূপ বিশাল যে কালক্রমে ইহা ‘ষট্খণ্ডগম’ হতে পৃথক হয়ে পৃথক গ্রন্থ বলে
 বিবেচিত হলো। এই অংশের টীকাও পৃথক। টীকার নাম ‘মহাধ্বলা’। ভূতবলি আচার্য গ্রন্থের
 প্রণেতা। রচনাকাল আনুমানিক দ্বিতীয় শতাব্দীতে। এ গ্রন্থখানি ও জৈন শৌরসেনী ভাষায়
 রচিত। জীবের বন্ধনই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু জীব বন্ধন দোষ হতে বিমুক্ত হবে এবং
 কত প্রকার বন্ধন আছে—এ সমস্ত বিষয়েরই আনুপূর্বিক আলোচনা আছে।

তিলোকপ্রস্তুতি

যতি বৃষত্তাচার্য কর্তৃক বিরচিত প্রাকৃত ভাষায় লিখিত ‘ত্রিলোকপ্রজ্ঞপ্তি’ একটি প্রাচীন দিগন্বর গ্রন্থ। এতে ভূ-বিবরণ, বিশ্বনির্মাণ কৌশল বিষয়ক সমূহের বহু তথ্যমূলক তত্ত্ব নিহিত আছে। প্রসঙ্গগ্রন্থে এর মধ্যে জৈনদের পৌরাণিক কাহিনী, কালনিরূপণ এবং বিভিন্ন মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। জম্বুদ্বীপ, বীতকীখণ্ডবীপ, পুঁকরদ্বীপ প্রভৃতি বহু দ্বীপের এবং জৈন কালচক্রের বিস্তৃত বিবরণ এর মধ্যে পাওয়া যায়। এক কথায়, জৈনশাস্ত্র ও তত্ত্ব উভয়রূপে আয়ত্ত করতে হলে গ্রন্থখানি পাঠ করা আবশ্যিক। গ্রন্থখানি মহাধিকার দ্বারা বিভক্ত এবং অতি প্রাচীন, কারণ, ‘ধৰলা’ নামক টীকার এর উল্লেখ আছে।

দিগন্বর জৈনদের আগম গ্রন্থ অতি বিশাল। কিন্তু এখন পর্যন্ত খুব বেশী মুদ্রিত হয় নি। অধুনা বহু পণ্ডিতের দৃষ্টি এদিকে পড়েছে।

৫ শ্বেতাস্বর আগম গ্রন্থ

শ্বেতাস্বর জৈনগণ কিন্তু পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থগুলিকে তাঁদের আগম গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। তাঁদের মতে ‘দৃষ্টিবাদ’ সম্পূর্ণ লুপ্ত এবং এর অন্তর্গত কোন গ্রন্থ নেই। সে যাই হোক, দিগন্বর ও শ্বেতাস্বর গ্রন্থনিচেয়ের সংমিশ্রণে জৈনদের ধর্মগ্রন্থ পরম্পরারের পরিপূরক ও সম্পূরক। সুতরাং ‘দৃষ্টিবাদ’ ভিন্ন শ্বেতাস্বর জৈনদিগের আগম গ্রন্থ ৪৫ খানি। নিম্নে এদের সংস্কৃত নাম দেওয়া হলো।

(ক) একাদশ অঙ্গ গ্রন্থ— (১) আচারাঙ্গ সূত্র, (২) সূত্রকৃতাঙ্গ সূত্র, (৩) স্থানাঙ্গ সূত্র, (৪) সমবায়াঙ্গ সূত্র, (৫) ভগবতী ব্যাখ্যা প্রজ্ঞপ্তি, (৬) জ্ঞাত ধর্ম কথা, (৭) উপাসকদশা সূত্র (৮) অন্তকৃত্বদশা সূত্র, (৯) অনুত্তরৌপ্যপাতিকদশাসূত্র, (১০) প্রশ্নব্যাকরণানি, (১১) বিপাকশ্রুত।

(খ) দ্বাদশ উপাঙ্গ সূত্র—(১২) উপপাতিকদশা সূত্র, (১৩) রাজপ্রশ্নায়, (১৪) জীবাভিগম, (১৫) প্রজ্ঞাপনাসূত্র, (১৬) সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি, (১৭) জম্বুদ্বীপ প্রজ্ঞপ্তি, (১৮) চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি, (১৯) নিরয়াবলী, (২০) কল্পাবতৎসিকা, (২১) পুষ্পিকা, (২২) পুষ্পচূলিকা, (২৩) বৃহিদশা।

(গ) দশ প্রকীর্ণ—(২৪) চতুঃশরণম, (২৫) আতুরপ্রত্যাখ্যানম, (২৬) ভজ্ঞপরিজ্ঞা, (২৭) সংস্কার, (২৮) তন্দুল বৈতালিক, (২৯) চন্দ্রবিদ্যা, (৩০) দেবেন্দ্রস্তব, (৩১) গণিতবিদ্যা, (৩২) মহাপ্রত্যাখ্যান, (৩৩) বীরস্তব।

(ঘ) ষষ্ঠ দেসসূত্র—(৩৪) নিশীথ, (৩৫) মহানিশীথ, (৩৬) ব্যবহার, (৩৭) আচারদশা বা দশাশ্রূতস্তব, (৩৮) কল্পসূত্র বা বৃহৎকল্প, (৩৯) জিতকল্প বা পঞ্চকল্প।

(৫) চতুর মূলসূত্র—(৪০) উত্তরাধ্যয়ন সূত্র, (৪১) আবশ্যক সূত্র,
(৪২) দশবৈকালিক সূত্র বা ওঘনিযুক্তি, (৪৩) পাঞ্চিক সূত্র বা পিণ্ড নিযুক্তি।

(৬) স্বয়ংপূর্ণ গ্রন্থসমূহ—(৪৪) নান্দীসূত্র, (৪৫) অনুযোগদ্বার।

৬ জৈন আগম বহির্ভূত সাহিত্য

এর পর আগম বহির্ভূত সাহিত্যের কথা বলা হচ্ছে। জৈনাগম বহির্ভূত সাহিত্য হলো নিযুক্তি, চূর্ণ, অবচূর্ণ, ভাষ্য প্রভৃতি।

(ক) নিযুক্তি

জৈনগণ স্বীয় আগম গ্রন্থকে বোঝাবার জন্য সেই সেই গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখতে আরম্ভ করলেন। সেই ব্যাখ্যাগ্রন্থই পরবর্তী কালে এক সাহিত্যে পরিণত হলো। সেই জাতীয় সাহিত্যের নাম ‘নিজুক্তি’ (নিযুক্তি)। বেদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যেরূপ নিরূপের উৎপত্তি সেরূপ জৈনাগম সাহিত্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই জাতীয় নিযুক্তি গ্রন্থের উৎপত্তি।

কেউ কেউ অনুমান করেন যে আগম গ্রন্থের রচনাকালে বা কিছু পরেই এই নিযুক্তি গ্রন্থের আবির্ভাব। কারণ আগম গ্রন্থের মধ্যেই দেখা যায় দুটি নিযুক্তি গ্রন্থের উৎপত্তি—পিণ্ডনিযুক্তি ও ওঘনিযুক্তি। বর্তমানে নিম্নলিখিত আগমের নিযুক্তি দৃষ্ট হয়ঃ—(১) আচারাঙ্গ সূত্রের, (২) সূত্রকৃতাঙ্গ সূত্রের, (৩) সূর্যপ্রজ্ঞপ্তির, (৪) উত্তরাধ্যয়নের, (৫) কল্পসূত্রের, (৬) দশবৈকালিকের, (৭) দশাশ্রতক্ষণের, (৮) কল্পসূত্রের, (৯) ব্যবহার সূত্রের, (১০) খৰিভাবিত সূত্রের নিযুক্তি।

দ্বিতীয় ভদ্রবাহুকে এ জাতীয় গ্রন্থের রচয়িতা বলে ধরা হয়। নিযুক্তিসমূহ আর্যছলে জৈনমহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত। আচার্যগণ এ জাতীয় নিযুক্তি কঠস্থ করে রাখতেন। পরবর্তী কালে এই নিযুক্তিই বৃহৎ আকার প্রাপ্ত হয়ে চূর্ণি ও ভাষ্যগ্রন্থে পরিণত হয়ে নতুন সাহিত্যের আকার ধারণ করেছে। আবার তা হতে টীকা, বৃত্তি, অবচূর্ণ ইত্যাদির উৎপত্তি হয়েছে।

(খ) চূর্ণি

যেমন শ্঵েতাম্বরদের নিযুক্তি, তেমনি দিগ়ম্বরদের চূর্ণিসূত্র। শ্঵েতাম্বরদের আগমগ্রন্থের চূর্ণিসূত্র থাকলেও দিগ়ম্বরেরা তাদের আগমগ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মূলতঃ চূর্ণির উৎপত্তি করলেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। নিযুক্তি হোল একটি কঠিন বা, পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা, আর চূর্ণি হলো শব্দের এবং সূত্রের উভয়ের ব্যাখ্যা। নিযুক্তি সাধারণতঃ পদ্যাত্মক; আর চূর্ণি গদ্যাত্মক। চূর্ণিসূত্রকেই অবলম্বন করে পরবর্তী কালে ভাষ্য, টীকা প্রভৃতির উৎপত্তি হয়েছে বর্তমানে নিম্নলিখিত চূর্ণি দৃষ্ট হয়ঃ—(১) গুণধর,

প্রাচীত 'কষায়পাষত' চূর্ণি, (২) শিববর্মার 'কম্পপয়জি' চূর্ণি (কর্মপ্রকৃতি), (৩) শিববর্মার 'সতক' চূর্ণি (বা বহুশতক চূর্ণি), (৪) 'সিউরী' চূর্ণি (সপ্ততিকা চূর্ণি)। এছাড়া লঘুশতক চূর্ণি এবং বৃহচ্ছতক চূর্ণিও আছে। শ্বেতাস্বরদের আগম ঘটের চূর্ণির সংখ্যা সতের। নীচে এদের নাম দেওয়া হোল।

আগমগ্রন্থ	নিযুক্তি (সংখ্যা-১১)	চূর্ণি (সংখ্যা-১৭)	ভাষ্য (সংখ্যা-৬)	টীকা (কার) (সংখ্যা-৫)
আচারাঙ্গ	আচা-নিযুক্তি	আচারাঙ্গ-চূর্ণি	শীলাক	
সূত্রকৃতাঙ্গ	সূত্রক-নিযুক্তি	সূত্রকৃতাঙ্গ-চূর্ণি	শীলাক	
ভগবতী		ভগবতী-চূর্ণি		অভয়দেব সূরি
অন্যান্য			মালয়ালম (মাত্র) অক্ষয়	
অঙ্গগ্রন্থ	ক ত্বকাও মুণ্ডাও	গুণ্ঠাসূক্ত ত্বকাও মুণ্ডাও	ত্বকাও মুণ্ডাও	অভয়দেব সূরি
রাজপ্রশ্নায়	বাস্তুত্বাত্মক চূর্ণি	বাস্তুত্বাত্মক-চূর্ণি	মালয়ালম (মাত্র) মালয়ালম	মলয়গিরি
জীবাভিগম	বসাদ্বাচ চূর্ণি	জীবাভিগম-চূর্ণি	বাসিগী বাসাদ্বাচ	হরিভদ্র সূরি,
	মালুষ্ট্রু ক্রান্তী	৩০৬ মালুষ্ট্রু চূর্ণি	বাসিগী বাসাদ্বাচ	মলয়গিরি
প্রজ্ঞপনা	চ ক্রান্ত মালুষ্ট্রু চূর্ণি	চ ক্রান্ত ক্রান্ত মালুষ্ট্রু চূর্ণি	এক মালুষ্ট্রু ক্রান্তি	মলয়গিরি
জ্বুদীপ্তি	চুর্ণী চ ক্রান্ত মালুষ্ট্রু	গুরুবিদ্বালী চ ক্রান্ত মালুষ্ট্রু	ও ক্রান্তি মালুষ্ট্রু	চুর্ণী চ ক্রান্ত মালুষ্ট্রু
প্রজ্ঞপ্রতি	ক্রিপ্ত চুর্ণী মালুষ্ট্রু	চুর্ণী চ ক্রান্ত মালুষ্ট্রু	ক্রান্ত মালুষ্ট্রু ক্রান্তি	হরিভদ্র সূরি
চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্রতি	চুর্ণী চ ক্রান্ত মালুষ্ট্রু	চুর্ণ মালুষ্ট্রু ক্রান্তী	মালুষ্ট্রু নামাচাক	মলয়গিরি
নিশীথ	প্রতিস্থানী নিশীথ	নিশীথ-চূর্ণি	নিশীথ-ভাষ্য	নিশীথ চুর্ণী প্রতিস্থানী
মহানিশীথ		মহানিশীথ-চূর্ণি	মালুক প্রাচার	
ব্যবহার	ব্যবহার-নিযুক্তি	ব্যবহার-চূর্ণি	ব্যবহার-ভাষ্য	মলয়গিরি
দশান্তকল্প	দশান্ত-নিযুক্তি	দশান্ত-চূর্ণি	দশ বীকু মালুষ্ট্রু	দশ বীকু মালুষ্ট্রু
বৃহৎকল্প	বৃহৎকল্প-নিযুক্তি	বৃহৎকল্প-চূর্ণি	বৃহৎকল্প-ভাষ্য	মলয়গিরি
পঞ্চকল্প বা (জিতকল্প)	পঞ্চ গুপ্ত চান্দো মালুষ্ট্রু	পঞ্চকল্প-চূর্ণি	পঞ্চকল্প-ভাষ্য	পঞ্চ গুপ্ত চান্দো মালুষ্ট্রু
		জিতকল্প-চূর্ণি	জিতকল্প মালুষ্ট্রু	
উত্তরাধ্যয়ন	উত্তরাধ্যয়ন- নিযুক্তি	উত্তরাধ্যয়ন-চূর্ণি	অ্যাক্ষয় অ্যাক্ষয়	বিচার মালুষ্ট্রু
আবশ্যক	আবশ্যক- নিযুক্তি	আবশ্যক-চূর্ণি	বিশেষাবশ্যক-	হরিভদ্রসূরি,
দশবৈকালিক	দশবৈকালিক-	দশবৈকালিক-মালুষ্ট্রু	ভাষ্য	মলয়গিরি
		দশবৈকালিক-মালুষ্ট্রু		হরিভদ্রসূরি তামী

ওঘনিষ্ঠিকি (পিণ্ড নিযুক্তি)	নিযুক্তি ওঘ-নিযুক্তি পিণ্ড-নিযুক্তি	চূণি ওঘনিষ্ঠিক-চূণি	ভাষ্য
নান্দীসূত্র		নান্দী-চূণি	
অনুযোগদ্বার		অনুযোগদ্বার- চূণি	হরিভদ্রসূরি, মলয়গিরি হরিভদ্রসূরি, মলধারী হেমচন্দ্ৰ
খবিভাষিতনিযুক্তি			

৭ প্রাকৃত (জৈন) রামায়ণ

যতদ্রূ জানা যায়, প্রাকৃত কাব্যজগতে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রাকৃত কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে বিমলসূরি কৃত ‘পটুমচরিয়ম’ (পদ্মচরিতম्)। গৃহ্ণথানি (জৈন) মহারাষ্ট্রী ভাষায় আর্যাচন্দে রামায়ণের বিষয় অবলম্বনে লিখিত। লেখকের মতানুসারে গ্রন্থের রচনাকাল মহাবীরের নির্বাগলাভের ৫৩০ বৎসর পরে। ১১৮টি সর্গে ৯০০০ শ্লোকে গৃহ্ণকার পদ্মের অর্থাৎ রামচন্দ্রের জীবনচরিত বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থে রামচন্দ্রের নাম পদ্ম রাখা হয়েছে। এরপে সীতা, হনুমান, সুগ্রীব প্রভৃতির নামাবলীরও পরিবর্তন ঘটেছে। লেখক বহু ব্যাপারেই বাল্মীকিকে অনুসরণ করেন নি এবং সমস্ত ঘটনার মধ্যেই একটা জৈন ভাবের পরিচয় দিয়েছেন। কাব্যথানি পাঠে বিমল আনন্দ অনুভূত হয়। অপদ্রংশ ভাষায় রচিত স্বয়ঙ্গুদ্বেরের ‘পটুমচরিউ’ এবং ধাহিলের (বা দাহিলের) ‘পটুমসিরিচরিউ’ ও এই শ্রেণীর অন্তর্গত প্রাকৃত রামায়ণ কাব্য।

৮ প্রাকৃত (জৈন) মহাভারত

প্রাকৃত ভাষায় আর একটি মহাকাব্য হচ্ছে ধ্বলকবি কর্তৃক বিরচিত প্রাকৃত মহাভারত ‘হরিবংশ পুরাণ’। গ্রন্থের রচনাকাল লেখকের মতে দশম বা একাদশ শ্রীষ্টাব্দে। মহাভারতের কাহিনী সর্বাংশে অনুসৃত না হলেও, লেখক এতে কৃষ্ণ ও বলরামের এবং কুরু ও পাণ্ডবদের ঘটনা নিচয় সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন এবং সকলকেই হয় জৈনদর্মে দীক্ষিত, না হয় জৈন ভাবাপন্ন করে তুলেছেন।

৯ প্রাকৃত পুরাণ বা চরিতাবলী

যেমন রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনা অনুসরণে প্রাকৃত রামায়ণ ও মহাভারত রচিত হয়েছিল, সেরূপ পুরাণের পক্ষা অনুসরণে প্রাকৃত পুরাণও রচিত হয়েছিল। জৈন

মহাপুরুষ বা তীর্থকরদের জীবনী অবলম্বনে এই প্রাকৃত পুরাণের সৃষ্টি। দিগন্বরেরা এ জাতীয় গ্রন্থকে ‘পুরাণ’ বলে অভিহিত করেন, আর শ্বেতাম্বরেরা ‘চরিতাবলী’ বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। এই প্রাকৃত পুরাণের রচনাকাল খীটান্দ অষ্টম শতাব্দী হতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত। ‘ত্রিষ্ঠিলক্ষণমহাপুরাণ’, ‘ত্রিষ্ঠিশলাকা-পুরুষচরিত’ প্রভৃতি প্রাচৌক্ত তীর্থকর মহাপুরুষদের জীবনচরিত অবলম্বনে পরিবর্তী কালে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তার মধ্যে ১০৮২ খ্রীষ্টাব্দে গুণচন্দ্র গাণিনের (১) ‘মহাবীর চরিয়ম’, ১১৫৯ খ্রীঃ হরিভদ্রের (২) নেরিণাহচরিউ (অপ), মাণিক্যচন্দ্র ও সকলকীর্তির (৩) ‘শাস্তিনাথচরিত’, ১২শ খ্রীঃ সোমপ্রভাতার্যের (৪) ‘সুমতিণাহচরিউ’, ১১৪৩ খ্রীঃ লক্ষ্মণগাণির (৫) ‘সুপ্রাসণাহচরিয়ম’ প্রভৃতি প্রাকৃত পুরাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দশম শতকে রচিত পুষ্পদত্তের ‘মহাপুরাণ’ একখানি উৎকৃষ্ট দিগন্বর জৈন পুরাণ গ্রন্থ।

୧୦ ପଟ୍ଟାବଳୀ ବା ଥେରାବଳୀ

পট্টাবলী (পত্রাবলী) বা থেরাবলী (স্থবিরাবলী) বংশপরিচয়ান্বক সাহিত্য, অর্থাৎ জৈন ধর্মগ্রন্থে যে সমস্ত আচার্য, তৎশিষ্য ও গণধরদের নামোন্নেখ আছে তাদের পরিচয় গাওয়া যায় এই পট্টাবলী বা থেরাবলী সাহিত্যে। ক'জন আচার্যের ক'জন শিষ্য ও গণধর ছিল, কে পূর্বে বা কে পরে, তাদের মোটামুটি একটি পরিচয় এই জাতীয় সাহিত্যে বর্ণিত আছে। এই সাহিত্যে প্রভৃতি গ্রন্থ বিদ্যমান। তার মধ্যে—(১) কঞ্চসুন্ত থেরাবলী, (২) নংদী-সুন্তপট্টাবলী, (৩) দুসমাকাল-সমন-সংঘথয়ঃ (৪) তপাগচ্ছপট্টাবলী, (৫) ব্রহ্মত্বরগচ্ছবহুণ্ডুর্বাবলী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

୧୧ ପ୍ରାକୃତ କାବ୍ୟ

সংস্কৃত সাহিত্যের মত প্রাকৃত কাব্যও ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, অলংকারে ও ঘটনার
পরিপাঠে মহীয়ান। ভাষার নিমিত্ত প্রবেশ করা সহজসাধ্য নয় বলে সাধারণ পাঠক এর
রসগ্রহণ থেকে বঞ্চিত। কিন্তু ভাষা একবার আয়ত্তীকৃত হলে, দেখা যাবে যে সংস্কৃত
কাব্য হতে এ কোন অংশে ন্যূন নয়। সংস্কৃত মহাকাব্যের যে সকল লক্ষণ আছে, সে
সমস্ত পুঁথানুপুঁথভাবে হয়ত এতে রক্ষিত হয় নি, কিন্তু এ কাব্য নতুনভাবে ভাবিত হয়ে
এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। সংস্কৃত মহাকাব্যের ন্যায় কোনও এক গ্রন্থ ইতে এর
ঘটনাসমূহ সচরাচরই গ্রহণ করা হয় নি, বরং অনেক কল্পনাশক্তি এ প্রাকৃত কাব্যজগতে
আত্মপ্রকাশ করেছে। মূল কথা এই যে, প্রাকৃত কাব্য পাঠে যথার্থ আনন্দ লাভ করতে
কোন অসুবিধা হয় না।

ଆକୃତିଭାବ୍ୟ ଯତ୍ନକାରୀ ଥାଣ୍ଡକାରୀ କୋଷକାରୀ ଧର୍ମକଥାକାରୀ, କଥାନକକାରୀ, ଗଦ୍ୟକାରୀ,

চম্পুকাব্য ইত্যাদি বহুজাতীয় কাব্য রচিত হয়েছে। তার মধ্যে নীচে কয়েকটির নামোদেশ করা হলো।

মহাকাব্য— প্রবরসেনের সেতুবন্ধ, হেমচন্দ্রের কুমারপালচরিত, সর্বসেনের হরিবিজয়, হরিভদ্রের সনৎকুমারচরিতম, ধনেশ্বরের সুরসুন্দরীচরিয়ম, জোইন্দ্র পরমপর্যাস, পুষ্পদণ্ডের নায়কুমারচরিউ, কনকামরের করকণ্ঠচরিউ, হরিভদ্রসুন্দর ধূর্ত্যাখ্যান, রামপাণিবাদের কংসবহো ও উসানিরংবাম, কৃতৃহলের লীলাবতীকথা ইত্যাদি।

ধৃগ্নকাব্য— হালের গাথাসপ্তশতী, জয়বল্লভের বজ্জালঞ্চ ইত্যাদি।

কৌষকাব্য— অধুনা লুপ্ত আনন্দবর্ধনের বিষমবাণলীলা ইত্যাদি।

অতিহাসিক কাব্য— বাক্পতিরাজের গড়ড়বহো ও মহমহবিজয় ইত্যাদি।

ধর্মকথাকাব্য— পাদলিপ্তাচার্যের তরঙ্গবতীর ছায়া অবলম্বনে লিখিত তরঙ্গলোলা, ধনপালের ভবিষ্যত্বকথা, হরিভদ্রের সমরাইচকথা, মলয়সুন্দরীকথা ইত্যাদি।

কথানককাব্য— কালকাচার্যকথানক, কথাকোষ, কথামহোদধি, কথারত্নাকর ইত্যাদি।

গদ্যকাব্য— সোমপ্রভাচার্যের কুমারপালপ্রতিবোধ, ধনপালের ভবিষ্যত্বকথা ইত্যাদি।

চম্পুকাব্য— জসোহুরচরিয়চম্পু, উদ্দ্যোতনের কুবলয়মালাচম্পু ইত্যাদি।

১২. প্রাকৃত নাটক— সংস্কৃত নাটকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষাই বিদ্যমান। স্ত্রীলোক বাদে উচ্চ শ্রেণীর পাত্রগণ সংস্কৃতে, আর স্ত্রীলোকসহ নিম্ন শ্রেণীর পাত্রপাত্রীগণ প্রাকৃত ভাষায় বাক্যালাপ করেন। কিন্তু প্রাকৃত নাটক সেরূপ নয়। প্রাকৃত নাটকে উচ্চ-নীচ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই প্রাকৃত ভাষায় কথা বলেন। এ জাতীয় নাটককে সুটক বলে। এই নাটকে চারটি অঙ্ক থাকে এবং তার নাম জবনিকান্তর। বর্তমানে আমরা ছাঁটি প্রাকৃত নাটকের নামোন্নেখ পাই। যথা—

(১) রাজশেখরের (৯০০) কপূরমঞ্জরী,

(২) নয়চন্দ্রের (১৩৬৫-১৪৭৮) রঞ্জামঞ্জরী,

(৩) কুন্দদাসের (১৬৬০) চন্দ্রলেখাসুটক,

(৪) মার্কণ্ডেয়ের (১৭শ-১৮শ শতাব্দী) বিলাসবতী,

(৫) বিশ্বেশ্বরের (১৮ শঃ শতাব্দী) শৃঙ্গারমঞ্জরী, এবং

(৬) ঘনশ্যামের (১৭০০-১৭৫০) আনন্দসুন্দরী।

১৩ প্রাকৃত বৈজ্ঞানিক সাহিত্য

নিম্ন আচারণ ক্ষেত্রে (১)

কেবল প্রাকৃত কাব্যাদি রচনা করে প্রাকৃত সাহিত্যের পরিভৃতি হয় নি, বরং সংস্কৃতের ন্যায় বিজ্ঞানমূলক রচনা পদ্ধতি দ্বারা এক প্রকার প্রাকৃত বৈজ্ঞানিক সাহিত্যেরও সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলোরও একটু পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।

(ক) প্রাকৃত কোষ বা অভিধান

সংস্কৃত সাহিত্যে কোষ বা অভিধান গ্রন্থ প্রচুর। প্রাকৃতে আমরা কেবল দুটি কোষগুলোর পরিচয় পাই—একটি ধনপালের ‘পাইয়লচ্ছিণামমালা’ আর একটি হেমচন্দ্রের ‘দেশীনামমালা’। এ দুটি গ্রন্থই বর্তমানে পাওয়া যায়। কিন্তু এছাড়া আরও প্রাকৃত অভিধান ছিল বলে অনুমান করা যায়। কারণ, হেমচন্দ্রের দেশীনামমালার টীকায় অনেক প্রাকৃত অভিধানকারীর নামের উল্লেখ আছে।

(খ) প্রাকৃত-ব্যাকরণ

ব্যাকরণ রচনায় প্রাকৃত সাহিত্যের একটু বিশেষত্ব লক্ষিত হয়েছে। প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ মূলতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণের অবলম্বনে লিখিত। কচ্চায়নের ‘পালি ব্যাকরণ’ যেরূপ পালি ভাষায় রচিত, প্রাকৃত ব্যাকরণ সেরূপ নয়। সূত্র রচনায় সংস্কৃতের পন্থাই অনুসরণ করেছে। বহু প্রাকৃত ব্যাকরণ দৃষ্ট হয়। তার মধ্যে—(১) বরুণচির প্রাকৃত-প্রকাশ, (২) চণ্ডের প্রাকৃত লক্ষণ, (৩) হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণ, (৪) ত্রিবিক্রমের প্রাকৃত ব্যাকরণ, (৫) ক্রমদীপ্তিরের প্রাকৃত ব্যাকরণ, (৬) লক্ষ্মীধরের ষড়ভাষাচন্দ্রিকা, (৭) সিংহরাজের থ্রুত্তরপাবতার, (৮) মার্কণ্ডেয়ের প্রাকৃতসর্বস্ব, (৯) শ্রতসাগরের ওদায়চিন্তামণি, (১০) রামশর্ম তর্কবাগীশের প্রাকৃতকল্পতরু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত ব্যাকরণে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী, পৈশাচী, অপভ্রংশ, প্রাচ্যা, আবস্তী চাঙালী, শাবরী, টক্কী, নাগর, ব্রাচ্চড় প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষা ও উপভাষার লক্ষণাদি লিপিবদ্ধ আছে।

(গ) প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্র

প্রাকৃত ছন্দোগ্রন্থ প্রভৃতি রচিত না হলেও, এর ছন্দোরাশি বিশাল। বিশেষ করে নব্যভারতীয় ছন্দের উৎপত্তির ব্যাপারে এর অবদান অনেক। পিঙ্গলাচার্যের ‘প্রাকৃত পিঙ্গল’ অপভ্রংশ ভাষায় রচিত একখানি প্রাকৃত ছন্দোগ্রন্থ। এতে ‘মাত্রা বৃত্ত’ ও ‘বর্ণবৃত্ত’ উভয় জাতীয় ছন্দই বিদ্যমান। গাহা, বিগ্গাহা, উগ্গাহা, রোলা, দোহা, মত্তা করবলক্খণ, মল্লিকা, চচ্চরী প্রভৃতি ছন্দ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হেমচন্দ্রের ‘ছন্দোনুশাসনম্’, আর একটি প্রাকৃত ছন্দোগ্রন্থ। কবিদর্পণও প্রাকৃতছন্দের একটি উৎকৃষ্ট ছন্দোগ্রন্থ।

ଏହୋ ପଞ୍ଚ ନମୋକାରୋ ସବଧାର-ଶୁଣ୍ୟାସଗେ ।
ମଙ୍ଗଳାଂଚ ସରୋଦିଂ ପଥମଂ ହୋଇ ମଙ୍ଗଳଂ ।

ଅର୍ଥମାତ୍ରକରଂ ଏଥରାଟକଂ ପରମୋଷ୍ଟିଃ ।

কর্মসূচি-বিনির্মাণে মোক্ষ-লগ্নী-নিকেতনে। ॥৪

ମୟବ୍ରାଦି-ଓଗୋପେତ୍ ସିକ୍ଷାତ୍ମଙ୍କ ନମାମ୍ୟହମ

বিশ্বাসঃ প্রলয়ঃ যাত্রি শাকিলী-ভূত-পম্বগঃ ।

ପ୍ରମାଣିତ ହେଲାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜିନେଥରେ ॥

ନାହାର ପଦ୍ଧତି ଆଗରାର, ଆଗରାର ଏଣ୍ଟାର୍ଟିକ୍

କ ଯେ ଜୈଜ୍ଞ ନମୋକାର ଯତ୍ତେ ଅରହତୀଗଂ୍. ଅବିଦ୍ୟା

আছে। সম্প্রদায় হিসেবে তিনটি পাঠই প্রচলিত।

ଶ୍ରୀ ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟରେ ତିଳଟି ପାଠ ସମ୍ପର୍କେ ବିଜ୍ଞାନରେ

ପ୍ରାଣଶାଖେ ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ସବରେ ଏକଟା ହିତଯ

পৰি 'জেন সান্দেশ' নামক একটি পত্ৰ অভিগৱ চাঁদ

যা আরিহত্ত্বাণং' শৰ্মিষ্ঠক প্রবন্ধে তিনি একটি সমস্যা

ଶ୍ରୀମତେ ପାତ୍ରଙ୍କିଳୀ—

—ଏହି ନମୋକାର ସମ୍ପ୍ରଦୟ ଆହେ, ତାତେ ଅହିଂସାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯାହାର ପାଇଁ ଜୀବନରେ କଥା ନାହିଁ।

’। এই তিনটি পাঠের মধ্যে কোন পাঠটি সমীচীন

ପାଦନାହଟୀ ମହିଶ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ । ତବେ ତିନି ବଲେଛେ ଯେ

ଖାନେ ତୋର ଅର୍ଥ ହିଲେ ଅର୍ହ ଅର୍ଥାଏ ତୀର୍ଥକର ବା ଜି

ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ କାହିଁ ବେଶନେ ଆରହିତ୍ତାଗଂ୍ରିତ ହେବାନି (ଯାନେର) ଶାଖକେ ନାଶ କରେଲେ ତାକେ ନମ୍ବରାଳି ଦେବାନି ପାଠେ ଦୃଢ଼ ଶବ୍ଦ ଆଛେ

‘আরিংহন্তুগণ’ অর্থাৎ যিনি আয়োজক প্রথমে শহরকে মাখ করেছেন। কিন্তু এভাবে শব্দকে বিশ্লেষণ করলে তা একসময়ের ‘প্রত্যক্ষতাকে’ উপাদিত সামা ভূমিতে করার হাতে তাঁদের প্রতি অন্যায় এবং অবিচরণ করা হবে। কিন্তু উজ্জ্বলাদে ধর্মনিক ও আধীশ্বরিক বাচ্যা দিয়ে এ পাঠ সময়ে ডেজনগণ বহু হত টীকা-চিপ্পলি লিখে দিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ উজ্জ্বল করা যেতে পারে যে যেখানে শব্দের অস্তুত অর্থ নিয়মিত হয় না সেখানেই পাঠিগণ নিয়ে রে বিশ্ববৰ্দ্ধি

অনুমানের সেই পাঠকে বেঞ্চ করন কেন বিশেষভাবে ভাবিত হয়ে থাকের বাইকরণের
অতি লাক্ষ্য রেখে একটি অর্থ করন থাকেন। সেই আর্থের ফলস্বরূপ তারা প্রত্যু ধায়ার
অবিভাগাতে করে থাকেন। 'আরিহঙ্গাংশে'তে দিক তাই হয়েছে বলু আমার ধরণে।
১৯৩৩ সালের ঘোনতে শর্তেন পরিষদের মধ্যকালীন অধিবেশনে শ্রীঅগ্ন
চাঁদ গাহোর মহাশয় বিদ্র গোষ্ঠীর সমূখ্যে 'মৃত্যু সম্বন্ধে আবার উপরোক্ত প্রেরণ
উপায়েন করলেন। যাতার স্মরণ আছে তাতে মনে হয় যে তাঁর বক্তৃতা ছিল এই যে
অবস্থাগং 'আরিহঙ্গাংশ' অবস্থাগং এইজনের পাঠকের মধ্যে কোনটি সংস্কৃত ও কেনটি
যা প্রাচীনতম বলে মনে হয় এবং এরপে পাঠকেরই বা কারণকি? এ প্রশ্নের উপায়েন পূর্বক
তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডীর নিকট উত্তরের আশা করেছিলেন। অব্যাপক N. V. Vadaya মহাশয়
অবস্থাজ্ঞ বিশ্বকর্মের মাধ্যমে এই শব্দের এ জাতীয় নিন্তি নাপ হয়েছে বলে অভিমত
প্রকাশ করেন। এর পর দেবেশ কুমার জৈন মহাশয় শব্দের মাথাখাঁড় সম্বন্ধে
প্রকাশ পূর্বক N. V. Vadaya-এর মতকেই প্রকারণতে সমর্থন করেছিলেন। অবশেষে
আমাকে এ বিষয়ে কিছু বলতে অনুরোধ করলে আমি আচার্ম শ্রীতুলনী মহারাজ ও
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডীর সম্মুখ্যে যা বলেছিলাম তার সারমর্ম এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

ଏତିଥିମିକ ଦୃଷ୍ଟିର ଉପର ନିର୍ଭର କରିଲେ ଯାନେ ହୀ 'ଆରହତାଙ୍ଗ' ପାଠିଲି ପାଚିନତ୍ମ। କାରଣ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ଵିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ 'ଖାରମଲେ'ର ଶତିଶ୍ଶମ ଶିଳାଲୋକେ 'ଆରହତାଙ୍ଗ' (ନୟୋ ଆରହତାଙ୍ଗଃ ନୟୋ ସର-ନିଧିନଃ) ପାଠିଲି ଦୃଷ୍ଟି ହୀନ୍ତା ତାର କିଛି ପରେ ମୁହଁରା ଶିଳାଲୋକେ ଏରାପ ପାଠ ଦେଖା ଯାଏ । ତାଙ୍କାର ଦିଗିବର ଜୈନଦେଶ ଧର୍ମରୀହେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରେ 'ଆରହତାଙ୍ଗ' ପାଠିଲେ କୌନ କୌନ କ୍ଷେତ୍ରେ 'ଆରହତାଙ୍ଗ' ପାଠିଲେ ପାତ୍ରମା ଯାଏ । ଏତାବେ ବିଚାର କରିଲେ ଏହା କାରାତେ କାରାତେ ଯାତେ ଶୌରମେଣୀ ଭାବୀ ପ୍ରାଚିନତମ ବଳେ ଶୀକୃତ ହଲେ ଦିଗିବର ଆଗମ ଏହି ହୃଦାତ ପ୍ରୋତ୍ସହେର ଦାରୀ କରାତେ ପାରେ । ଯାଦିଓ ଏ ବିଷୟେ ଆମରା ଏଖନଙ୍କ ଢାଡାତ ଶିକ୍ଷାତେ ଉପଗ୍ରହ ହତେ ପାରିନି । ଏ ଦିକ ଦିମେ କିମର କରିଲେ ମନୀ ହୀ 'ଆରହତାଙ୍ଗ' ପାଠିଲୁ ଶରୀରିନା । କିନ୍ତୁ କାଳକର୍ମେ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିର ମାଦ୍ୟମେ ହେବ ଅଗର ମୁଣ୍ଡ ('ଆରହତାଙ୍ଗ' ଓ 'ଆରହତାଙ୍ଗ') ପାଠେର ଉତ୍ତରଣ ହୁଯାହେ । ଯାଦିଓ ଏ ମୁଣ୍ଡ ପାଠିଲେ ଆହୁତ ବ୍ୟାକରଣ ମୁଖ୍ୟ । ଅର୍ଥାତ୍

সংস্কৃত
আকৃতে
অরহ
অরিহ
অরহ

প্রমাণের জৈনধর্ম

সংস্কৃত আই খাতু পূজা অর্থে ব্যবহৃত হয় (আই-পূজায়াম)। আই খাতু জালিনীয়—

অর্জিত অর্হতঃ, অহিতি ইত্যাদি কৌপ হয়। এই আই খাতুর সঙ্গে শৃঙ্খল প্রত্যয়া করলে আই শৃঙ্খল মিলে যায়। এর অর্থ পূজনীয়, পূজা, বা পূজার যোগ। এই আই শৃঙ্খলের প্রথমাংশের বাস্তবনে অঙ্গু শব্দ হয়। এর জাপ অঙ্গু অর্হতো, অর্হতঃ। সংস্কৃত আই শৃঙ্খলের বচ্চীর অরিহ এবং অরহ হতে পারে।

সংস্কৃত আকৃতে বিপ্রকর্ষ বিধি অনুসারে অরহ শৃঙ্খলে আই শৃঙ্খলকেও উভয়টি করে আই শৃঙ্খলের প্রয়োগ আছে। কিন্তু সেইপ অর্থ তীর্থকরদের বিশেষ প্রয়োগ আছে। কেবল অরিহতু শৃঙ্খলের বাপোরে তারা অরিহ+তু শৃঙ্খলে আই শৃঙ্খলের প্রয়োগ আছে। এই শৃঙ্খলের প্রয়োগ অর্থ তীর্থকরদের সম্পর্কে এরও অর্থে সংস্কৃত সাহিত্যে এর বহুল প্রয়োগ আছে। কিন্তু সেইপ অর্থ তীর্থকরদের বিশেষ প্রয়োগ আছে। কেবল অরিহতু শৃঙ্খলের বাপোরে তারা অরিহ+তু শৃঙ্খলে আই শৃঙ্খলের প্রয়োগ আছে। এই শৃঙ্খলের প্রয়োগ অর্থ তীর্থকরদের সুত্রও তুলনীয়। উভয়টি কেবল অরিহ এবং অরহ হতে পারে। স্বরভাবে বিপ্রকর্ষের সাধারণ অর্থ হচ্ছে যে উভয়ের গের মৌলিকতারে অঙ্গু শব্দ আকৃতে বিপ্রকর্ষ বিধি অনুসারে অরহ অরিহ এবং অরহ হতে পারে। স্বরভাবে বিপ্রকর্ষের সাধারণ অর্থ হচ্ছে যে উভয়ের গের মৌলিকতারে অঙ্গু শব্দ আকৃতে বিপ্রকর্ষ বিধি অনুসারে অরহ অরিহ এবং অরহ হতে পারে।

(হে. ২.১১) ৫ হৃষী-কৃঞ্জ-পিণ্ডি-দিঙ্গাছিঃ (হে. ২.১০৪) ইত্যাদি সুন্তে অই শৃঙ্খলে প্রয়োগ সংস্কৃত বাঙ্গলুর কে তে তার মধ্যে স্বরবর্ণন আনন্দন করা। এই শৃঙ্খলে মৌলিক প্রয়োগ নয় বলে তারা এর একটি আধাৰিক ও সামান্য ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। বলে শৃঙ্খলে মৌলিক প্রয়োগ নয় বলে তার করেছেন তাকে ‘অরিহতু’ বলে। আসলে কিন্তু অরিহ অর্থে শৃঙ্খলকে যে হতা করে তাকে নমস্কার করা বিধিসন্দত্ত নয়। বিশেষ করে এটা জৈন ধর্মের প্রতিবূল (পরিপন্থী) নয়। শৃঙ্খল কিন্তু সূলতঃ ‘অরিহতু’ নয়। শৃঙ্খল হলো অরিহতু এবং তার অর্থ হবে পূজা বা পূজনীয় (adorable)। এর অর্থ শৃঙ্খলের পক্ষাতে অর্থগত বোন ঘোষিত করে আছে। অরিহতু শৃঙ্খলের মধ্যে কোনটি আছাগত পক্ষাতে অর্থগত বোন ঘোষিত করে আছে। অরিহতু শৃঙ্খলের নিয়মসমূহের সেখানে একটী নিয়ম লক্ষ্য করে থাকেন। তাদের মাত্রে সাধারণতঃ বিপ্রকর্ষের নিয়মসমূহের সেখানে ‘আ’ আগম হয় যে অরহ অরিহ এবং অরহ শৃঙ্খলের মধ্যে কোনটি আনন্দন কর্তব্যে ইত্য তার পূর্ব স্বরের দীর্ঘ হয়। সেজন্য উভ তিনিটি শৃঙ্খলের ৬৯ এর পূর্ব অকারের দীর্ঘ হয়েছে। সংক্ষেপে শৃঙ্খল দীর্ঘালো এরাপ—

অরহ+তু+আ+গং=অরিহতু
অরিহতু+আ+গং=অরিহতু

আকৃতি শব্দ সংস্কৃত আই হতে নিষ্পত্ত হওয়ায় এর অর্থত এক হওয়া বিধেয়। কিন্তু অরহতু এবং অরিহতু শৃঙ্খলের অর্থ একার্থৰ এরাপ অভিমত অনেকেই পোষণ করে থাকেন। কিন্তু অরিহতু শৃঙ্খলের অর্থ একার্থৰ এরাপ অভিমত পোষণ করে থাকেন। এর থাকেন। কিন্তু অরিহতু শৃঙ্খলের অর্থ একার্থৰ এরাপ অভিমত পোষণ করে থাকেন। এর কারণ কি? তার উভয়ের বনা হচ্ছে যে—

অরিহতু শৃঙ্খল অরিহতু (অরিহতু) শৃঙ্খলে সারণ করিয়ে দেওয়ায় অনেকেই প্রাকৃত অরিহতু শৃঙ্খলকে সংস্কৃত অনুসারে ‘আরিহতু’ এরাপে বিশেষিত করে দ্বা মে

দ্বিতীয় পাত্র প্রত্যামাণ শৰ্ম তা ভুলে নিয়ে এর অর্থ করেন ‘মিনি শৰ্মক হতা করেন।’ কিন্তু অরহতু শৃঙ্খলকে অর+হতু এরাপত্রারে বিশেষিত করেন কেনি সমৰ্থ না বলে তারা শৃঙ্খলকে উভারে বিশেষিত করেন না। বাদিত সংস্কৃত অর শৃঙ্খল অর্থ spoke এবং এ অর্থে সংস্কৃত সাহিত্যে এর বহুল প্রয়োগ আছে। কিন্তু সেইপ অর্থ পূজনীয়ই করে থাকেন। এরাপে অরহতু শৃঙ্খলকেও অর+হতু এভাবে বিশেষিত করেন না। কারণ এভাবে বিশেষ করলে আরিহতু শৃঙ্খলের বাপোরে তারা অরিহ+তু রূপে বিশেষিত করে থাকেন। এবং অরিহতু শৃঙ্খলের অর্থ তীর্থকরদের সম্পর্কে সুরক্ষিত করে থাকে অরিহতু শৃঙ্খলের প্রয়োগ অর্থ তীর্থকরদের সম্পর্কে সুরক্ষিত করে থাকে। এটা জৈন ধর্মের প্রতিবূল (পরিপন্থী) নয়। শৃঙ্খল কিন্তু সূলতঃ ‘অরিহতু’ নয়। শৃঙ্খল থাকেন যিনি মনের শৃঙ্খলে জয় করেছেন তাকে ‘অরিহতু’ বলে। আসলে কিন্তু অরিহ অর্থে শৃঙ্খলকে যে হতা করে তাকে নমস্কার করা বিধিসন্দত্ত নয়। বিশেষ করে এটা জৈন ধর্মের প্রতিবূল (পরিপন্থী) নয়। শৃঙ্খল হলো অরিহতু এবং তার অর্থ হবে পূজনীয় (adorable)। এর অর্থ শৃঙ্খলের পক্ষাতে অর্থগত বোন ঘোষিত করে আছে। অরিহতু শৃঙ্খলের মধ্যে কোনটি আছাগত পক্ষাতে অর্থগত বোন ঘোষিত করে আছে। অরিহতু শৃঙ্খলের নিয়মসমূহের সেখানে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে অরহ অরিহ এবং অরহ শৃঙ্খলের মধ্যে কোনটি আনন্দন কর্তব্যে ইত্য তার পূর্ব স্বরের দীর্ঘ হয়। সেজন্য উভ তিনিটি শৃঙ্খলের ৬৯ এর পূর্ব অকারের দীর্ঘ হয়েছে। সংক্ষেপে শৃঙ্খল দীর্ঘালো এরাপ—

অরহ+তু+আ+গং=অরিহতু
অরিহতু+আ+গং=অরিহতু

আকৃতি শব্দ সংস্কৃত আই হতে নিষ্পত্ত হওয়ায় এর অর্থত এক হওয়া বিধেয়। কিন্তু অরহতু এবং অরিহতু শৃঙ্খলের অর্থ একার্থৰ এরাপ অভিমত পোষণ করে থাকেন। কিন্তু অরিহতু শৃঙ্খলের অর্থ একার্থৰ এরাপ অভিমত পোষণ করে থাকেন। এর কারণ কি? তার উভয়ের বনা হচ্ছে যে—

অরিহতু শৃঙ্খল অরিহতু (অরিহতু) শৃঙ্খলে সারণ করিয়ে দেওয়ায় অনেকেই প্রাকৃত অরিহতু শৃঙ্খলকে সংস্কৃত অনুসারে ‘আরিহতু’ এরাপে বিশেষিত করে দ্বা মে

কঙ্গলোক গণনা করা যায়, কিন্তু কাঙাতীতে লোক গণনা করা যাবে না। কঙ্গলোক স্মীল ভাগে বিভক্ত। যথা—(১) সৌধর্ম, (২) ধৈশন, (৩) সামুদ্রম্যার, (৪) শাহেজ (৫) ব্রাহ্ম, (৬) রাম্যাত্মক, (৭) লাত্তক, (৮) কাপিষ্ঠ, (৯) শুক্র, (১০) মহাত্তক্ত, (১১) শতর, (১২) সহস্র, (১৩) আনন্দ, (১৪) থাণ্ড, (১৫) অরণ এবং (১৬) অচ্যুত।

কঙ্গলীতে লোকেন্য প্রোবেয়ক এবং পাঁচ অনুভৱ আছে। অনুভৱ বিমান থেকে ১২ মোজন উত্তৃতে অবস্থিত সর্বোচ্চ শিখর সিদ্ধান্তিলা। সেখানে সিদ্ধ জীবগণ বাস করেন। সংখ্যায় তৰ্মা অনন্ত এবং শাশ্বতভাবে বিবাজযান আছে।

১৫। জৈন কালচক্র ও মুগ্ধকঙ্গলা কি?

হিংশাপ্রে যেমন সত্ত, ত্রেতা, ধৈশন ও কলিযুগ, সেইরূপ জৈনশাপ্রে কালচক্রকে সুলভাবে দু'ভাগে ভাগ করা হয়—অবসাপিলী ও উৎসাপিলী। প্রত্যেকটি কালকে অবস্থাটি উপবিভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেকটি ভাগের নাম কাল। বর্তমান অবসাপিলী কালের ভাগ নিম্নরূপ :

- (১) সুবমা—সুবমা (মহাসুখের কাল),
- (২) সুবমা (কেবল সুখের কাল),
- (৩) সুবমা—দুঃখমা (বেশীর ভাগ দুঃখের ও কম দুঃখের কাল),
- (৪) দুঃখমা—সুবমা (বেশীর ভাগ দুঃখের ও কম দুঃখের কাল),
- (৫) দুঃখমা (কেবল দুঃখের কাল। এখন একাল চলাছে),
- (৬) দুঃখমা—দুঃখমা (তীব্র দুঃখকষ্টের কাল।)

উৎসাপিলী কালের ভাগও অনুভৱ। আরুষ হ্রা—দুঃখমা—দুঃখমা থেকে এবং পরিগতি সুবমা—সুবমায়। এক একটি বিভাগের নাম ‘আর’ বা ‘পার্বি’। যে কালে আয়ু, বল, সুখ, শরীরের পরিমাণ ক্রমশঃ হাস পেতে থাকে, তাকে ‘উৎসাপিলী’ কাল বলে, আর যে সময়ে সেগুলো বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাকে ‘উৎসাপিলী’ কাল বলে। একটির পর আর একটি কাল। এভাবে অন্যাদিকাল হতে কালচক্র চলে আসছে। প্রত্যেক কালের তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগে চক্রশঙ্খ তীর্থকর আবিষ্ট হন খোঁস। বর্তমানে অবসাপিলী কাল চলছে এবং এ কালের ২৪ জন তীর্থকের মধ্যে প্রথম তীর্থক-র খ্যাতদের ও শেষ তীর্থকর বর্ধমান মহাবীর।

১৬। জৈনমতে বিশ্বিভাগ কি খরণে? একটি সবিজ্ঞে বলবেন?

জৈনশাপ্রে এই পারিদৃশ্যমান বিশ্বকে মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত করা হয় : লোক ও অলোক। এ বিভাগের মধ্যেই জৈন দর্শনের নবতত্ত্ব (nine cardinal principles or

ମୁଣ୍ଡରୀ କାର୍ଯ୍ୟ (six substances) ନିହିତ ଆଛେ ଯିନି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯା ପଦାର୍ଥରେ

জ্বারজ্জ্বালা প্রাণ কুণ্ডলিতে সংবর্ন-নিষ্ঠ র বাংখে ঘোকখো য অবাংতি তে জ

(ପରାମିତିକାରୀ) (ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଷୟରେ) ପରାମିତିକାରୀ

অর্থাৎ (১) জীব, (২) অজীব, (৩) আত্ম (কন্ত), (৪) বাস্তু, (৫) শুণি, (৬) গাথা
(৭) সংস্কর, (৮) নিষ্ঠার্যা ও (৯) মোক্ষ—এ নয় পদার্থ। আর যদি এব্যাহলো—জীবের
অর্থ আকাশ, পৃষ্ঠাগুল ও কাল।

জেনাশ্বে নবতত্ত্ব সীকারের কারণ বিষয়সম্বাবনকে জানা। বিষয়সম্বাবন বিষয় পদার্থ শাস্তি মিস্টিং, তাদের পরম্পর সম্ভব কি প্রবাল, কেম এবং কিভাবে আশ্চর্য কর যে এর তা থেকে মুক্তি পাবার উপায় কি—এ সব জানতে হলে বিষয়সম্বাবন সুভাতত জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। বিষয়ের এই খুলতত্ত্বকে জেনাশ্বেন' ডাগে ডাগ করাছে তারে নাম বরতত্ত্ব এই নবতত্ত্বের প্রথম দৃষ্টি—জীব ও অজীব-তত্ত্বের মধ্যেই বিষয়ের সম্ভব পর্যাপ্ত নির্মিত আছে। অপর ছটি তত্ত্ব জীব বা চেতন আশ্চর্য কিভাবে অজীব বা জড় শব্দের দ্বারা আবৃত হয় এবং তা থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় সেগুলো বিষয় হয়েছে। নীচে চিত্রের সাম্মান্যে এ সকলের সম্পর্ক দেখান হচ্ছে।

ଶ୍ରେଣୀ	ନମ୍ବର	କାର୍ଯ୍ୟ	ଲାକ
(ଅନୁଷ୍ଠାନିକ)			
ଆଗମିକ			
୧. ଜୀବ	୧.	ଜୀବ (ଡେତେ) (୧)	୧. ଜୀବ (୩୦୫)
୨. ଅଜୀବ	୨.	ଅଜୀବ (ଡେତେ) (୧)	୨. ସର୍ପ (୩୦୫)
୩. ଆସର ପାତା	୩.	ଆସର ପାତା (ଡେତେ) (୧)	୩. ଅଧର୍ମ (୩୦୫)
୪. ସର୍ପ	୪.	ସର୍ପ (ଡେତେ) (୧)	୪. ଆକାଶ (୩୦୫)
୫. ପୃଷ୍ଠା	୫.	ପୃଷ୍ଠା (ଡେତେ) (୧)	୫. ପୃଶ୍ଣିଳ (୩୦୫)
୬. କାଳ	୬.	କାଳ (ଡେତେ) (୧)	୬. କାଳ (୩୦୫)
୭. ମଂଗଳ	୭.	ମଂଗଳ (ଡେତେ) (୧)	୭. ମଂଗଳ (୩୦୫)
୮. ନିର୍ଜଳ	୮.	ନିର୍ଜଳ (ଡେତେ) (୧)	୮. ନିର୍ଜଳ (୩୦୫)

३८

জীৱনৰ লক্ষণ :
বিশেৰ লোক অংশে যে নটি তত্ত্ব বা পদাৰ্থ আছে তাৰ প্ৰথম তত্ত্বহলো জীৱ। যাৰ চেতনা আছে, তাৰে জীৱ বলো। জীৱ হলো চেতনালক্ষণকৰ্ত্তা। চেতনা অভিত যে

জীবের প্রধান লক্ষণ উপযোগ, অর্থাৎ তেতো-জিনিত বৈধাণ্ডি।
আবার উত্তোধনসম্মতে (২৪।১) জ্ঞান, দর্শন, চারিত্ব, বীর্য আনন্দ প্রতিক্রিয়ে
জীবের লক্ষণ বলা হয়েছে— (১)
গাণং চ দংসণং চেব চরিতং চ তপো তথ্য।
বীরিযং উপওগো য এযং জীবস্তু লক্ষণং।।

‘জ্ঞান, ধর্মনি, চারিত্ব, তপস্যা, বীর্য এবং উপযোগ এগুলো হলো জীবের লক্ষণ।’
জীব সংখ্যায় অসংখ্য এবং প্রত্যেক জীবের পৃথক সত্ত্ব আছে। এরা সাক্ষাত ও
নিরাকার দ্রেষ্টব্য প্রকার। যে চেতনা বা বৈধশক্তির দ্বারা গ্রাহ কর্তৃর বিশেষ বিশেষ
প্রকার জ্ঞান হয় তাকে সাক্ষাত উপযোগ বলে এবং যে চেতনা বা বৈধশক্তির দ্বারা

সময় জেন ধর্ম সংস্কৃতি ও দর্শন এ সকল তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নেটওর্ক

ଲୋକ ଓ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ।

ନିଶ୍ଚରଣ ମେ ଅରଣ୍ୟ ଜୀବ (ଚତୁର) ଓ ଅଜୀବ (କଷ୍ଟ) ଆବଦ, ତାକୁ ଜୋକ ସଙ୍ଗେ ନାମ ପ୍ରକାର ଆଶୀ ଓ ବିଶ୍ଵରତନର ବୈଚିତ୍ର୍ଯ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ବିଶାମାନ ବିଶ୍ଵର ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ପ୍ରତିକେ ଶୁଣି, ସିଦ୍ଧି ଓ ସଂହର କର୍ମ ସଂଘର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ । ଏହି ଅଂଶ ଯାଦି ଶୀର୍ଷିତ, ତଥାପି ଚତୁରିକେ ଅମ୍ବଖ୍ୟ କୋଡ଼ି ଯୋଜନ ପରିନିମିତ ହେଉୟାମ ଅଭିତ ବିହିର ଏବଂ ଦେଇଲୁ ଏକ ଅମ୍ବିନ

গাহাবতের সামান্য জ্ঞান হয়, তাকে নিরাকার উপযোগ বলে। সাকার জ্ঞানকে সবিলম্ব বোধ বা জ্ঞান বলে, আর নিরাকার জ্ঞানকে নির্বিকল্প বোধ বা দশন বলে। এই জ্ঞান দশনেরই সাধারণভাবে উত্তোলনশূন্যে জীবের লক্ষণ বলা হয়েছে।

জীবের ক্ষতিক্ষেত্রে পর্যাম আছে সেগুলো হলো— অরূপিত, অনবগাইত, অতোক সমৃদ্ধ ও অব্যাপক।

জীবের বিভাগ :

বীজেত চিত্তের সাহায্যে প্রথমেই এদের সম্পর্ক দেখান হচ্ছে।

জীব ও বিভাগ	প্রথম বিভাগ	বিভিন্ন বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	বিভিন্ন বিভাগ	বিভাগ
(ক) সংসারী জীব	হ্রাসৰ→ অসমক সমন্বয়	(অমনক্ষ ও বীক্ষিয় ত্বীক্ষিয় চতুর্ভুজীয় পক্ষপ্রিয়	অবক্ষিয় বীক্ষিয় ত্বীক্ষিয় চতুর্ভুজীয় পক্ষপ্রিয়	অবক্ষিয় বীক্ষিয় ত্বীক্ষিয় চতুর্ভুজীয় পক্ষপ্রিয়	দেব→ ব্রহ্মপতি ত্বীক্ষিয় বীক্ষিয়
(খ) মৃত্যু বিভাগ	নির্বিশেষ (১) সিদ্ধ	তীর্থক সিদ্ধ	নারক	মৃত্যু	ত্বীক্ষিয়
(খ) মৃত্যু ও নিষ্ঠ	জগতিক (কর্মবর্ধন (শরীর মৃত্যু	(২) অহং (৩) আচার (৪) উপাধায় (৫) সাধ	চক্ষ ধারা কর্ণ ধারা জিহ্বা ধারা নাতিকা ধারা	ইতিমুক্ত দর্শনেক্ষিয় ব্রহ্মণেক্ষিয়	ইতিমুক্ত দর্শনেক্ষিয় ব্রহ্মণেক্ষিয়
		অযোগী			শ্রাবণেক্ষিয়

জীব প্রথমতঃ দু'প্রকারেঁ: সংসারী ও মৃত্যু বাসিন্দ। সংসারী জীব আবার দু' প্রকারেঁ—
শরীর ও বৃক্ষ। আবার আবার দু' প্রকারেঁ—অমনক্ষ ও সমনক্ষ।

মৃত্যু জীবও আবার দু' প্রকারেঁ—নির্বিশেষ (সিদ্ধ) ও জগতিক। সিদ্ধ আবার দু'
প্রকারেঁ—জগতিক দু' প্রকারেঁ—যোগী ও অযোগী।
যোগীকেও আবার দু'ভাগে তাগ করা যেতে পারে—অর্হ ও অন্যান্য।

সিদ্ধ, অর্হ, আচার, উপাধায় ও সাধ এ পাঁচ সিদ্ধ পুরুষদের নমস্কার করা হয়।
এদের নিয়েই 'স্মোকর' মৃত্যু।

(ক) সংসারী জীব :

জীবকুলকে যে দু'ভাগে তাগ করা হয় তার প্রথম তাগ হলো সংসারী জীব। যাদের
জ্ঞান, বৃদ্ধি ও শৃঙ্খল আছে এবং যারা সংসার হতে মুক্তি পাওনি তারা সংসারী জীব।

সংসারী জীব সূলতঃ দু'ভাগে বিভক্ত : হ্রাসৰ ও অস। যে জীব গমন শক্তি রাখিত
অর্থাৎ একস্থান হতে অন্য স্থানে যেতে পারে না, তাকে হ্রাসৰ জীব বলে। আর যে জীব
কিন্তু এস জীব অমনক্ষ ও সমনক্ষ ভেদে দু' প্রকারে। এ দুটি জীবকে আবার ইতিমুক্ত
অনুসারেও ভাগ করা হয়। ইতিমুক্ত—চক্ষ, কর্ণ, জিহ্বা, নাতিকা ও দৃক। সে হিসেবে
সংসারী জীবকে পাঁচ ভাগে তাগ করা হয়—একেকিয়, দীক্ষিয়, গৌক্ষিয়, চতুর্ভুজীয় ও
গোক্ষিয়। হ্রাসৰ জীব একেকিয় এবং এস জীব দীক্ষিয় থেকে পোকেক্ষিয় পর্যন্ত হতে
পারে। হ্রাসৰ একেকিয় জীব পাঁচ প্রকারঃ পৃথিবীয়, অপৰ্বীয়, অগ্নিকায়, বায়ুকায় ও
বনশপ্তিকায়। যে পাঁচটি ইতিমুক্ত আছে তাদের ঘৰা পাঁচটি ইতিমুক্ত জ্ঞান হয়। যেমন—

জীব	নির্বিশেষ (১) সিদ্ধ	তীর্থক সিদ্ধ	সীমান্ত	ইতিমুক্ত জ্ঞান
জীব	যোগী (২) অহং (৩) আচার (৪) উপাধায় (৫) সাধ	চক্ষ ধারা কর্ণ ধারা জিহ্বা ধারা নাতিকা ধারা	পুরুষেক্ষিয়	শ্রাবণেক্ষিয়

নীচে একেছিয়ানি জীবের সম্পর্ক দেখান হচ্ছে।

জীবিত	পদ্ধতি	বিভাগ	উদ্দেশ্য
শুষ্ক (স্পন্শ)	ক্ষিতি অপ-	পৃথিবীর অপকার আঘিকার বায়ুকার্য	বৃক্ষ, পাতার, খাদ্য প্রস্তুতি। জল, শিশির, শিলাবস্তুর আশীর্বাদ। বাতাস, বাতা, ধূর্বাতাদি।
অর্থ (যোগ)	অপ-	বনস্পতিকার্য	বৃক্ষ, লতা, উল্চ প্রস্তুতি।
বীজিয়	স্পর্শ ও রসনা	জলোকা, বৃক্ষ, শাখা প্রস্তুতি। পিণ্ডিকা, উৎকুণ,	
অস	স্পর্শ, রসনা, আগ,	মহুশ প্রস্তুতি। শিশির, অমর, শশক প্রস্তুতি।	
চৃত্তিরিয়	স্পর্শ, রসনা, আগ, দৰ্শন	মহুশ, দেব, নারক, ত্বক।	
পার্শ্বক্ষেত্রিয়	স্পর্শ, রসনা, আগ, দৰ্শন ও অৱশ্য		

একেলিয়— যে জীবের কেবলমাত্র স্পর্শক্ষেত্রিয় জিম অন্য কোন ইন্দ্রিয় নেই। তাকে একেলিয়— যে জীবের কেবলমাত্র স্পর্শক্ষেত্রিয় জিম অন্য কোন ইন্দ্রিয় নেই। তাকে একেলিয়— যোদের স্পর্শক্ষেত্রিয় ও রসনেক্ষেত্রিয় মাত্র আছে, তারা বীজিয় জীব।
বীজিয়— যোদের স্পর্শক্ষেত্রিয় ও রসনেক্ষেত্রিয় আছে তারা বীজিয় জীব।
চৃত্তিরিয়— যোদের স্পর্শক্ষেত্রিয়, আগেক্ষেত্রিয়, রসনেক্ষেত্রিয় ও দর্শনক্ষেত্রিয় আছে তারা চৃত্তিরিয় জীব।

পার্শ্বক্ষেত্রিয়— যোদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই আছে, তারা পার্শ্বক্ষেত্রিয় জীব।

পার্শ্বক্ষেত্রিয় জীব হলো দেব, মানব, শারক ও ত্বকৰ্ক। এরা জীবগুলি করে এবং আয়ুর্মে এবং মৃত্যু হয় এবং আরার জন্মগুলি করে। যে প্রমত্ন মৃত্যি পায় সে পার্শ্বক্ষেত্র এবং জীব। জীবের মৃত্যু হয় এবং আরার জন্মগুলি করে। যে প্রমত্ন মৃত্যি পায় সে পার্শ্বক্ষেত্র এবং জীব। জীবের মৃত্যু হয় এবং আরার জন্মগুলি করে। যে প্রমত্ন মৃত্যি পায় সে পার্শ্বক্ষেত্র এবং জীব।

বীজিয়— যোদের স্পর্শক্ষেত্রিয়, আগেক্ষেত্রিয় ও রসনেক্ষেত্রিয় আছে তারা বীজিয় জীব।
চৃত্তিরিয়— যোদের স্পর্শক্ষেত্রিয়, আগেক্ষেত্রিয় ও রসনেক্ষেত্রিয় আছে তারা চৃত্তিরিয় জীব।

পার্শ্বক্ষেত্রিয় জীবের পরিচয় :

পার্শ্বক্ষেত্রিয় জীব মূলতঃ চর প্রকার— দেব, মনুষ্য, নারক ও ত্বকৰ্ক।

দেব :

দেবগণ চারভাগে বিভক্ত— দেবগণ, বাত্র, জ্যোতিষ ও বৈমানিক। এ সকল

দেবগণ অসাধারণ শালিঙ্গালী ও দীর্ঘায়। এদের আয় এত দীর্ঘ যে এদেরকে অব্যরোধ করা যাতে পারে। কিন্তু প্রতিগোক্ষে এরাও যুরণলী। বাগের স্তরভেদে দেবগণের আয় বল, প্রতির, মুত্তি ও সুখ উত্তরোক্ত মুত্তি পায়। এরা বাগের পথ পথিবীর বিভিন্ন আয়, আসার প্রস্তুতি।

হজলেন অবসরকুমার, শাগকুমার, সুপর্কুমার ইত্যাদি।

বাত্র দেবগণ পৃথিবীর উপরে, নীচে ও সমতলে বাস করেন। এরা হজলেন যাক, গুর্ব, দৃত নিষাচ, কিমর, বিষপুরুষ ইত্যাদি।

গুর্ব, দৃত নিষাচ, কিমর, বিষপুরুষ ইত্যাদি।

অঙ্গর্ত।

বৈমানিক দেবগণ বহ উৎকৃশ বাস করেন। জোতিক্ষেত্রে বহ উৎকৃশ বৈমানিক দেবগণ বহ উৎকৃশ বাস করেন। জোতিক্ষেত্রে বহ উৎকৃশ বৈমানিক দেবগণ বহ উৎকৃশ বাস করেন। জোতিক্ষেত্রে বহ উৎকৃশ বাস করেন। জোতিক্ষেত্রে বহ উৎকৃশ বাস করেন।

মারক :

যে সকল জীব নরকে জন্মগুলি করে নরকেই বাস করে, তাদের নারক না নারকীয় জীব বাসে। যারা এই পৃথিবীতে পাশাপারণ করে তারা মৃত্যুর পর নরকে নিয়ে নারকীয় জীব বাসে। তারও উৎপন্ন হয়। স্থানের বাস করে এবং তীব্র দুঃখ কষ্ট ও ব্যস্তা তোগ করে। নারক স্থর্গে এরা বাস করেন। নারক স্থর্গে এরা বাস করেন। নারক স্থর্গে এরা বাস করেন।

যদ্যো তোগ করে। দৃতাগের অভ্যন্তরে এই সাতটি নারক অবস্থিত।

ত্বকৰ্ক :

(খ) মৃত্য বাসিক জীব :

যাঁরা সম্পূর্ণ কর্মসূল করে মৃত্যি বা নির্বাণ লাভ করেছে তারা মৃত্য বাসিক জীব। যাঁরা সম্পূর্ণ কর্মসূল করে মৃত্যি বা নির্বাণ লাভ করেছে তারা মৃত্য বাসিক জীব। যাঁরা সম্পূর্ণ কর্মসূল করে মৃত্যি বা নির্বাণ লাভ করেছে তারা মৃত্য বাসিক জীব। যাঁরা সম্পূর্ণ কর্মসূল করে মৃত্যি বা নির্বাণ লাভ করেছে তারা মৃত্য বাসিক জীব। যাঁরা সম্পূর্ণ কর্মসূল করে মৃত্যি বা নির্বাণ লাভ করেছে তারা মৃত্য বাসিক জীব। যাঁরা সম্পূর্ণ কর্মসূল করে মৃত্যি বা নির্বাণ লাভ করেছে তারা মৃত্য বাসিক জীব। যাঁরা সম্পূর্ণ কর্মসূল করে মৃত্যি বা নির্বাণ লাভ করেছে তারা মৃত্য বাসিক জীব।

ত্বেন দশন মতে যে কোন প্রাণী সেই শরীরে মৃত্যি পান না।

(১৫ পৃষ্ঠার পৃষ্ঠা)

ক্ষয় করে শুন্ধুরাপে জন্মগ্রহণ করে শুভজীব জন্য সাধনা করতে হয়। জীবের অশুন্ধ ও সম্মসারণ স্বত্ত্বাবৃত্ত। যখন যে শুন্ধীরে অবস্থন করে তান সেই শুন্ধীরে যোগে সে অবস্থন করে। যদি পিপুলিলা বা ইষ্টীরনে জন্মগ্রহণ করে, তাহলে পিপুলিলা বা ইষ্টীর শুন্ধীর যোগে অবস্থন করে। কিন্তু শুভজীব পানীর জন্য তারে শুন্ধ শুন্ধীরাপে জন্মগ্রহণ করে শুভজ পেতে হয়। একবার সংসার থেকে শুভজ পেলে তারে আর সংসার পুনরাগমন করতে হয় না।

সংসারী ও শুভজীবের খণ্ডে শুলগত পার্থক্য হলো যে সংসারী জীব কল্পী ও সাত্ত্বিক আর শুভজীব অরূপী ও অধিক্ষয়, সংসারী জীব নিজকর্মের কর্তা ও জন্মতেজা, আর শুভজীব কর্তৃত ও ভোক্তৃত উপর্যুক্ত।

শুভজীবের বিভাগঃ

শুভজীব দু'প্রকারের—নির্বাণগ্রাহ ও জাগতিক। নির্বাণগ্রাহ হয়ে যে জীব সিদ্ধ লাভ করেছে, তাঁরা নির্বাণগ্রাহ পূর্বসূর্য পুরুষ। সে জাতীয় সিদ্ধ পূর্বসূর্য দু'প্রকারের—নির্বাণ শুভজীবের সিদ্ধ ও সামাজিক। সিদ্ধিলাঙ্ঘের পূর্ববস্তুর খেকে যাঁরা জনন্মার্দে আনন্দে করে জৈবস্বর্গ প্রচার করেছে, তাঁদেরকে তীর্থকর সিদ্ধ বলে।

(সমতত্ত্ববৃত্ত বৃহৎস্বত্ত্বস্ত্রোতৃ)

বিনি প্রশ্নত্বে শ্রেষ্ঠ ধৰ্মতত্ত্ব দেবিয়েছে এবং যে অবস্থা পেয়ে মানুষ দুঃখ অধিক করতে পারে তাকে তীর্থকর বলে। আর যাঁদের আজ্ঞা সামান্যভাবে শুভজ তাঁরা সামাজিক পুরুষ।

জাগতিক শুভজীব দু'প্রকারে—যোগী ও অযোগী। যোগী হলেন অর্হৎ। এরা তৃষ্ণামুক্ত কর্ম ক্ষয় করে এবং যে অবস্থা পেয়ে মানুষ দুঃখ অধিক হলেন—আচার্ম, উপাধায় ও সাধু। আচার্ম হলেন সংঘের প্রধান, উপাধায় হলেন অধ্যাপক, সাধু বা যোগী পুরুষ। আর সাধু হলেন গৃহতানী ব্রহ্মচারী পুরুষ।

জৈবধর্মে শাকলো শুভজ পুরুষ হলেন পাঁচজন—সিদ্ধ, আর্চ, আচার্ম, উপাধায় ও সাধু এবং কেক পরমেষ্ঠীও বলা হয়। জৈলগণ এবং দেবকেই প্রতিনিয়ন নমস্কার করে থাকেন। এবং দেবকে নিয়েই নামাকর মৃত্তা নীচে এবং দেব সামাজিক একটু পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।

বিনি :

জেসিং জীবসহায় গাছি অতাবে য সক্ষয় তস্ম।

তে হোণ্তি জিজ্ঞাস্য সিদ্ধা বাচ-গোয়রমনীদা।।

‘দেবের শুভ আশাই হলো স্বতন্ত্র-সুস্থ এবং যাতে জীবের কেন স্বতন্ত্র-সুস্থ নেই। সেই অশুন্ধীর শুভাশাই হলো নিষ্ক পুরুষ। তাঁরা সমস্ত বাসের অতীত।’ নিষ্ক নেই সেই অশুন্ধীর শুভাশাই হলো নিষ্ক পুরুষ। তাঁরা সমস্ত বাসের অতীত।’ নিষ্ক নেই সেই অশুন্ধীর শুভাশাই হলো নিষ্ক পুরুষ। তাঁরা সমস্ত বাসের অতীত।’

‘দেবের শুভ আশাই হলো কর্মবন্ধন ক্ষয় করেছে। যাঁরা আজ্ঞার আট স্বর্গীয় জ্ঞানের অধিকারী, যাঁদের শুভ আশা বিশ্বের সরোচ শিখের হিঁরে, তাঁদেরই সিদ্ধ বলে ধরা হয়।’

‘ট্যাট্ট্ব-কম্বরং আট্টময়ণ-সমষ্টিয়া পরমা।’

লোয়াঝাটিদা শিকা নিজা জে এরিসা হোণ্তি।

(নিষ্কম্বার ৭২)

‘নিষ্ক হলেন তাঁরা যাঁরা আট প্রকার কর্মবন্ধন ক্ষয় করেছেন। যাঁরা আজ্ঞার আট প্রকার গুণের অধিকারী, যাঁদের শুভ আশা বিশ্বের সরোচ শিখের শাশ্বত ও স্থিরের পে অবস্থন করে।’

অহঃঃ

স্বল-বিষংক তৃতীয় বিপুরমন্ত্রি বস্ত্রত।

কম-চড়কই বিলতে গহি অংশা হৈই অরহংত।

(পরমায়ুপ্রবাপ ৩২৬)

‘অরহং হলেন তাঁরা যাঁদের আজ্ঞা বিপুরমন্ত্রের অবস্থন করে, যাঁরা সর্বপ্রকার প্রতিবেক্ষক চিন্তা নষ্ট করেছে এবং যাঁদের চতুর্ধি কর্ম ক্ষয়স বা ক্ষয় হয়েছে।’

ঘণমাটু-কম্বরহ্যা কেবল-শালাইপুরমণ্ডণ-সাহিয়া।

চৌতিসঅতিসহস্রতা অবিহংতা এরিসা হোণ্তি।

(নিষ্কম্বার ৭১)

‘যাঁরা চতুর্ধি আশামুঃসকারী কর্মবন্ধন থেকে শুভ, যাঁরা কেবল আনী ও অনন্তগুণের অধিকারী এবং যাঁরা চৌত্রিশ প্রকার অতি প্রস্তুত ঘোষায় সাজ্জত তাঁরা হলেন অরহং।’

আচার্মঃ

পংচাচারসময়া পংচিদিদ্যন্তিপশ্চিমলগ্নাম।

দীরা উগুগতীর আয়িমা এরিসা হোণ্তি।।

(নিষ্কম্বার ৭৩)

যাঁৰা পাঁচটি আচাৰৰিয়ি থাণৰিতি পালন কৰেন, যাঁৰা উপ্যত্ত হাতীৰ মত গণি
পাঁচ ইঙ্গীয়কে দমন কৰেন, যাঁৰা জনী ও উগজোৱে গজীৱ, তাঁদেৱকে আচাৰ থলো।

জোখাধাৰ :

ব্রহ্ম-ভূমি-সংজুল্লজ্জ জিন-কাহি-পৰ্যাখ-দেশমা সূৱা।

নিঙ়খ-ভাৰ-সহিয়া উবৰামা এৰিমা হোংতি।

(নিয়মসাৰ ১৪)

উপাধ্যায় হলেন তাৰা যাঁৰা তিৰত্বেৰ ধাৰা বিদ্রুষিত, জিন প্ৰচাৰিত তহ যাঁৰা
প্ৰকাশ কৰেন এবং যাঁৰা সাহসী ও নিঃস্বার্থ-ভাৰসম্পন্ন।

শাস্ম :

বাৰ-বিশ্বকু চাউকিহামাৰ্হা সমাৰতো।

নিশ্চথা নিয়োহা সাহ দে এৰিমা হোংতি।

(নিয়মসাৰ ১৫)

যাঁৰা জাগতিক সব ব্যাপৰ থেকে মুক্ত, যাঁৰা চতুৰ্বিধ আৰাধনায় (দৰ্শন, জ্ঞান,
চৰিত, তপস্যা) গভীৰভাবে লীন, যাঁৰা জাগতিক ব্যবন মুক্ত, যাঁদেৱ কোন মোহ নেই
তৰা হলেন সাধু।

এই পঞ্চ পৰামৰ্শীদেৱ জন্ম একটি সাংকৰিক মুক্ত আছে— অড়ম্ব বা ত্ৰুম্ব। এ
মুক্তি পঞ্চটি বৰ্ণনিৰ ধাৰা নিষ্পন্ন। সেগুলো হলো—অ, অ, আ, উ, ম। প্ৰথম 'অ'হলো
আই, দ্বিতীয় 'অ' হলো অশৰীৰী (অৰ্থাৎ সিদ্ধ), তৃতীয়টি হলো 'আ' অৰ্থাৎ আচাৰ্য,
চৰি, হলো উপাধ্যায় এবং 'ম' হলো মুনিৰা সাধু। হিন্দু-ত্ৰেষ্ণ-এৱ অনুকৰণে গঠিত হলো
এদেৱ যাছে অভিন্বন্ত আছে। এই জৈনধৰ্ম প্ৰাচাৰকাৰী জিনদেৱ জৈনগণ নিত্য নমস্কাৰ
কৰে থাকেন।

লোক-প্ৰশ়ংসনয়েৰ সুধৰ্ম-ত্ৰিখণ্ডেৰে জিগে বলে।

অৱহণ্টে কিঞ্জিহৈসে চৰ্তবীসং ত্ৰে কেবলিলো।।

(সামায়িকগঠ)

'আমি জিনদেৱ বদলা কৰি। যাঁৰা বিশ্বেৰ (জ্ঞানেৰ) প্ৰকাশক এবং আতি উৎকৃষ্ট
ধৰ্মতীর্থৰ প্ৰবৰ্তক। এজনপ চাৰিশ আইং ও কেৰল-জ্ঞানীদেৱ নমস্কাৰ কৰি।'

(২) অজীৱ :

লোকাশেৰ দিতীয় তত্ত্বটি হলো অজীৱ। অজীৱ জীৱেৰ বিপৰীত লক্ষণযুক্ত।
জীৱেৰ মে সমস্ত লক্ষণ আছে অজীৱ তাৰ বিপৰীত। জীৱ চেতনা লক্ষণযুক্ত; অজীৱ
চেতনশূন্য অৰ্থাৎ জড়।

অজীৱেৰ ভেদ :

অজীৱ বা জড় পাঁচ প্ৰকাৰ। যথা—

লোকাশেৰ ধৰ্মো অহোমো আগসং কোলো পুৰুল-জংতনো। হাতোৱাৰো

ত্ৰিশৰ্মা অৰ্থাৎ ত্ৰিশৰ্মা লোগো তি পৰমতো জিলেহি বৰদৰদিহি।। (উজ্জ্বা ২৪৯)

—'ধৰ্ম, আধৰ্ম, আকাৰণ, কাল, পুদ্গল ও জীৱ এ ছাঁটি দৰেৱ সমূহকে সৰ্বদৰ্শী
জিন লোক বলে অভিহিত কৰেছো।

—'ধৰ্ম, আধৰ্ম, আকাৰণকে এক একটি দৰ্য বলে অভিহিত কৰা হয়। আৱ কাল,

পুদ্গল ও জীৱকে অনস্ত দৰ্য বলা হয়।

কাল বাদে অপৰ চাৰিটিৰ সংগে অস্তিকাৰ্য যোগ হয়। তখন এদেৱ নাম হয়—
ধৰ্মস্তিকাৰ্য, আধৰ্মস্তিকাৰ্য, পুদ্গলস্তিকাৰ্য ও কাল। জীৱ দৰেৱ মধ্যে
পৰিগণিত হয় বলে জীৱকেও জীৱস্তিকাৰ্য বলা হয়ে থাকে।

(উজ্জ্বা ২৪৮)

১৭. অস্তিকাৰ্য শব্দেৱ অৰ্থ কি?

অস্তিকাৰ্য শব্দেৱ একটি বিশেষ অৰ্থ আছে। অস্তিঃ শব্দেৱ অৰ্থ হলো প্ৰদেশ।
কোন দৰেৱেৰ সুস্থানিসুস্থ অবিভাজ্য অংশকে প্ৰদেশ বলে। আৱ কাম শব্দেৱ অৰ্থ
হলো অবিভাজ্জা প্ৰদেশেৰ সমবায় বা সুস্থান। 'অস্তিকাৰ্য' শব্দেৱ ধাৰা সুস্থানিসুস্থ
অবিভাজ্জা প্ৰদেশ সমূহেৰ সমবায় নিৰ্মিত দৰেকে বোঝায়। জীৱ, ধৰ্ম, আধৰ্ম, আকাৰণ
ও পুদ্গল এ পঞ্চটি দ্বাৰা সুস্থানিসুস্থ অবিভাজ্য প্ৰদেশ নিয়মেৰ সমবায়ে নিৰ্মিত বলে
এদেৱকে 'অস্তিকাৰ্য' বলে। কাল দ্বাৰা সেৱণ প্ৰদেশেৰ নিয়মে গঠিত নয় বলে কালকে
অস্তিকাৰ্য বলে না। সুতৰং অজীৱেৰ ভেদ নিম্নলিখিত প্ৰকাৰ:

অজীব

অধ্যর্থ
ধর্মাত্তিকায়
অধর্মাত্তিকায়
আকাশ
পৃষ্ঠালু
পৃষ্ঠালুত্তিকায়

লোক
অঙ্গোক

(ক) ধর্মাত্তিকায় :

ধর্মাত্তিকায় স্বৈর ধারা গতিলক্ষণযুক্তি যোবামা। অর্থাৎ ধর্মাত্তিকায় দ্বাৰা জীব ও পৃষ্ঠালুৰ গতিতে সহায়তা কৰে। ধর্মাত্তিকায় দ্বাৰা না থাকলে জীব বা জড় দ্বৈৰ আধ্যে কৈন প্রকাৰ গতিৰ সভৱ হত না। ধর্মাত্তিকায় গতি সহায়ক, আৱাপী, অক্ষিয়, অচেতন ও সম্পূর্ণ লোক ব্যাপে অৱস্থিত।

(খ) অধর্মাত্তিকায় :

অধর্মাত্তিকায় দ্বাৰা স্থিতিলক্ষণযুক্তি। ধর্মাত্তিকায়ৰ বিপরীত। অধর্মাত্তিকায় না থাকলে জীব ও পৃষ্ঠালুৰ গতিদ্বৈৰ কথনও নিৰ্বাচি হতো না। অধর্মাত্তিকায়ও স্থিতিসহায়ক, আৱাপী, অক্ষিয় ও অচেতন, ও সম্পূর্ণ লোক ব্যাপে অৱস্থিত। সেজন্য উভ্যাধৰণনস্তে (২৮-১৯) বলা হয়েছে—

গই-লক্ষণে উ ধন্যে অহশ্মো ঠঁণ-লক্ষণে।

(গ) আকাশাত্তিকায় :

আকাশাত্তিকায় সমস্ত দ্বৈৰ ভাজন ও অবকাশ লক্ষণযুক্তি। তাই বলা হয়েছে—

(উভয়া ২৮-১৯)

অন্যান্য সমস্ত দ্বৈকে অবকাশ বা স্থান দান কৰে বলে এৰ নাম আকাশাত্তিকায় এই গুণটিই এৰ বিশিষ্ট গুণ। আকাশাত্তিকায় অনন্ত প্ৰদেশ সমূহৰ ধারা নিৰ্মিত ও সংখ্যাম যোজ একটি।

আকাশকে দুভাগে ভাগ কৰা যায়—লোক ও অলোক। লোকেৰ মাধ্যে আকাশেৰ যে অংশ, তাকে লোকাকাশ বলে, আৱ অলোকস্থিত আকাশকে অলোকাকাশ বলে। আকাশাত্তিকায়ও অবকাশ প্ৰদানকৰী, আৱাপী, অক্ষিয় ও অচেতন।

(ঘ) পৃষ্ঠালাত্তিকায় :

প্ৰত্যেক পৰমাণু বা পৰমাণুসমূহৰ সংযোগে উৎপন্ন সকল রকম ছোট ও বড়

পদার্থসমূহকে পুদ্গলাস্তিকায় বলে। যার পূরণ ও গলন হয় ('পূরণ-গলন-স্বভাবঃ পুদ্গলাস্তিকায়ঃ') অর্থাৎ বৃক্ষি ও হ্রাস হয়, তাকে পুদ্গল বলে। পুদ্গল সংখ্যায় অনন্ত। কৃপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি পুদ্গলের লক্ষণ। সন্দেহয়ার-উজ্জেও-পহা-ছায়া-তবেই বা।

বন-রস-গংথ-ফাসা পুঁঘলাণং তু লক্খণং ॥

(উত্তরা ২৮. ১২)

শব্দ, অঙ্ককার, উদ্যোত, প্রভা, ছায়া আতব, বর্ণ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এগুলো পুদ্গলের লক্ষণ। পুদ্গলের সামগ্রিক লক্ষণ নিম্নরূপঃ

পুদ্গল	প্রয়োগজ	ব্যক্তি	মনুষ্যাদির ভাষা।
শব্দ	বৈচিত্র প্রকার	অব্যক্তি	পশু পক্ষীর ভাষা।
মৃদু	বৈচিত্র প্রকার	তত	মৃদু, পটহাদি চর্মাদিত বাদিত্রের ধ্বনি।
বিতত			বীণা, সেতারাদি তারনির্মিত ধ্বনি।
ক্ষম চাহুন	চীক স্বাস্থ	ক্ষম চাহুন	সম্মত চাহুন ক্ষম চাহুন চাহিত
চাহুন	স্বাস্থ চ্যাহুন	চাহুন	ঘন্টা প্রভৃতির শব্দ।
ক্ষেত্রান্ত ম	ক্ষেত্রান্ত ম্যাত্র	শুবিরামজ মৰ্বাশী	শুবিরামজ মৰ্বাশী, শংখ প্রভৃতি ফুঁ দিয়ে বাজান ধ্বনি।
		সংঘর্ষ	কাষ্ঠাদির সংঘর্ষে উৎপন্ন ধ্বনি।

		চাহুন
বৈশ্বসিক	স্বাভাবিকসন্ধি	বিনা প্রয়াসে উৎপন্ন শব্দ। মেঘের গর্জন।
অঙ্ককার	মৃগ্নি (৮)	আলোর অভাব। (মৃগ্নি =) মৃগ্নামী (৮)
উদ্যোত	তত্ত্ব (৮)	মণি প্রভৃতির উষ্ণতারহিত প্রকাশ উদ্যোত। সীমা (৮)
প্রভা	চন্দে (৮)	চন্দ্রের প্রকাশ প্রভা। (চন্দে চন্দে =) মাসক (৮)
ছায়া	মুকুট (৮)	আবরণ দ্বারা রূপ প্রকাশকে ছায়া বলে। মুকুট (৮)
আতপ	চুচুচুর্ম (১)	সূর্যের উষ্ণ প্রকাশ আতপ। (চুচুচুর্ম =) লাচ (১)
বর্ণ	চীৎ মায়েন	১. কৃষ্ণ, ২. নীল, ৩. পীত, ৪. রঞ্জ, ৫. শ্বেত।
রস	চুচু মায়েক	১. তিক্ত, ২. কটু, ৩. মধুর, ৪. অম্ল, ৫. ক্ষয়ায়।
গন্ধ		১. সুগন্ধ, ২. দুর্গন্ধ।
স্পর্শ		১. স্নিফ্ফ, ২. রুক্ষ, ৩. শীত, ৪. উষ্ণ, ৫. মৃদু, ৬. কর্কশ, ৭. গুরু, ৮. লঘু। (স্নিফ্ফ তত্ত্ব চুক্ত চুক্ত

三

আছে। জীব ও পুরুষের মধ্যে যে আনন্দিত অবস্থার আগ্রহ হচ্ছে, তাকে কান্তি আয়োজন

ସର୍ବତେ ଜୟନ୍ତି ତାମାତେନ ତେନ ରାପେନ ତାନ୍ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୋଜନକଥାଂ ବର୍ଣ୍ଣନା ତେଜକଥାଂ ।
କାଳଃ । (ଲୋମିଚ୍ଛ ଦୀକ୍ଷା) ।

বেটি কেউ বলেন কালোরও সন্তু আছো। কংজিত পদাৰ্থন্য। কালমাত্ এবচিসময় পৰিমিত
এতে প্ৰদেশেৰ সমৰায় লৈছি। তাই একে অঙ্গিকায় বলা হয় না। কালও অৱলী ও অড়ত।

(୩) ଆଶ୍ରମ

তৃতীয় তদ্বের নাম আপ্রিয়। পুরুষের ধো এবং মহিলার আপ্রিয় বলে আশ্চর্য সহিত
বাথনের জন্য যে যে কারণে উভাস্তুত কর্মের আগমন হয়, তাকে আপ্রিয় বলে আশ্চর্য
হলো কর্মপ্রবাহ (influx of karma)। কর্মবাধনের কারণ হলো পাঁচটি। সে পাঁচটিকে
'পঞ্চ' আস্বাদ বলে। নৌচ সেগুলো দেখান হচ্ছে।

সংবরের বিপরীত	মহাত্মার বিপরীত
(১) মিথ্যাত্ত (= অবিদ্যা)	(১) হিংসা
(২) অবিবৃতি (=অসংখ্যম)	(২) অসত্ত
(৩) কষায় (= ত্রেষুধ, মান, ঘায়া, লোভ)	(৩) দৌর্য
(৪) প্রমাদ (= অনৱধানতা)	(৪) মৈথুন
(৫) যোগ (= কায়, মন, বাক্য)	(৫) পরিগ্রহ বা আসত্তি
এগুলোর দ্বারা উত্তীর্ণত কর্মের আগমন ক্ষা বলে এরা আস্ত্র।	বিষয়ের প্রতি আসত্তি ধৰ্মী কর্মবর্ধন হেতু এবাবে আস্ত্র

ପ୍ରମୋଦର ଜୀବନଧର୍ମ

প্রকারের পরমাণু জীবের মিথাদ, কায়-খনো-বচন, যোগ ও যাগ-যৈষাদি অধিবসায়ের
দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে আঘাত সহিত বদ্ধ হয়। আঘাতের মূল বস্তুপ হলো অসুস্থি, চেতনান্বয়,
শুল্ক ও নির্মল। যদিও আঘাত সহিত জীব, অতেজন পরমাণুর বক্ষন হতে পাওনা, কিন্তু
তথাপি অসুস্থি কাল থেকে এ বক্ষন চলে আসায় আঘাত আবরণময় হয়ে আছে। কর্মসূর
এই আবরণের নাম কার্মণ শরীর (অন্য দর্শন যাতে লিঙ্গ শরীর)। এই কার্মণ শরীরের
সংগে জীব অনাদিকাল থেকে সৃজ্জ থাকায় কর্ম বক্ষন হেতু নানা প্রকার অধিবসায় ও
প্রযুক্তির উদ্যয় হয়। তার ফলে জীব সংসারে নানা প্রকার দুঃখকষ্ট- ভোগ করে সংসার
চক্র দ্বারে বেড়াচ্ছে।

卷之三

(১) প্রকৃতিবর্ণঃ [(১) জ্ঞানাবরণী

(২) দর্শনাবরণগ্রন্থ

(୪) ମେହାନ୍ତିର
(୫) ଅଞ୍ଚଳୀ

卷之三

(୧) ମେଦିଗା
(୨) ଅନ୍ଯ

ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ (୭) ଗୋତ୍ର

(৪) আয়

(୮) ଶ୍ରୀତପାତ୍ର

ଶିଥ୍ରାନ୍ତିକ

卷之三

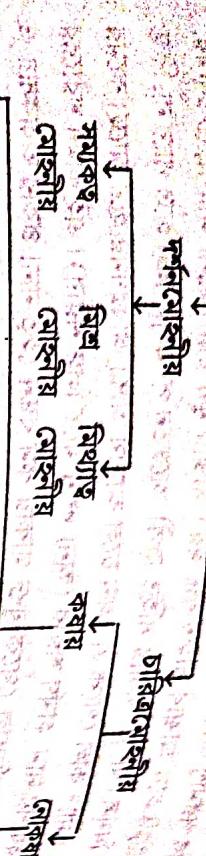
(୪) ପ୍ରଦେଶୀୟଙ୍କ :

ମୋହନୀୟ କର୍ମେର ବିଭାଗ :

ଶ୍ରୀଜ୍ଞନ କ୍ରମାଗୋଟେ ମାହିତେ ମାତ୍ର

卷之三

(৪) বক্ষঃ চতুর্থ তন্ত্র হলো বক্ষ। আঘাত সাহিত কর্মের বক্ষকে বক্ষ বলে। এক



হস্ত রাতি অরুতি শৌক ভৱ জুড়লা শ্রীবৈদ পুরুষবেদ নপুনসকল

১. অনঙ্গনুবক্ষী ২. অপ্রত্যাখ্যান ৩. প্রত্যাখ্যান ৪. সংজ্ঞলন

১. ক্রোধ
২. ক্রোধ
৩. ক্রোধ
৪. ক্রোধ

১. মান
২. মান
৩. মান
৪. মান

১. মায়া
২. মায়া
৩. মায়া
৪. মায়া

১. লোভ
২. লোভ
৩. লোভ
৪. লোভ

ওপস্থান ক্রমারোহ :

আঘাত স্বাভাবিক স্বরূপ শুভ্র চৈতেন্য ও পূর্ণ আনন্দ কর্মের নিবিড় আবরণে আচ্ছাদিত। এই আবরণ সমূহের মধ্যে মোহীয় কর্মের আবরণ প্রধান। চতুর্দশ প্রকার গুণস্থান ক্রমারোহ অতিক্রমের মাধ্যমে এই আবরণ দূর করে আঘাত গুণস্থানে পৌঁছেতে হয়। তাই এখানে চতুর্দশ গুণস্থান স্বর্বক্ষে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

চতুর্দশ গুণস্থান :

জৈনশাস্ত্রে 'গুণস্থান' শব্দের ধারা আঘাত বিকাশের ক্রমিক অবস্থাকে বুঝিয়ে থাকে। 'গুণ' শব্দের অর্থ এখানে 'আঘাতিক শক্তি'। তার স্থান অর্থাৎ বিকাশের ক্রমিক অবস্থা। আঘাত আবরণযুক্ত। এই আবরণ থেকে আঘাতকে মুক্ত কর্মার জন্য কতকগুলো মাধ্যমিক অবস্থা আবরণযুক্ত। এই আবরণ থেকে আঘাতকে মুক্ত কর্মার জন্য কতকগুলো মার্গে উপস্থিত আঘাতকে ক্রমিক কর্মান করা হয়েছে। এই আবস্থাগুলো বিকাশের মার্গে উপস্থিত আঘাতকে ক্রমিক করার অধিগত করে উপরিতর সোপানে আরোহণ করতে হয়। এই ক্রমিকগুলো অসংখ্য প্রকার আধিগত করে উপরিতর সোপানে আরোহণ করতে হয়। এই ক্রমিকগুলো সীমাবদ্ধ ক্র

হয়েছে। সেগুলোর নাম চতুর্দশ গুণস্থান। এই গুণস্থানকে সোপনাবলীর সহিত তুলনা করা যেতে পারে। সোপানে আরোহণ করে যেমন সৌধের উচ্চতম স্থানে পেঁচেনো যায়, সেরূপ এ সকল গুণস্থানের দ্বারা আত্মার মুক্তিসৌধে উপনীত হওয়া যায়। সেজন্য এর আর এক নাম গুণস্থান ক্রমারোহ। পূর্ব গুণস্থান অপেক্ষা পরবর্তী গুণস্থান শ্রেষ্ঠতর এবং কর্মবন্ধ নাশ করে শুভফল প্রদান করে। কর্মের বিশুদ্ধির দ্বারা গুণস্থানের বিকাশ হয়।

চতুর্দশ গুণস্থানের নাম নীচে দেওয়া হলো—

১. মিথ্যাদৃষ্টি বা মিথ্যাত্ম,
২. আস্থাদন-সম্যগ্দৃষ্টি,
৩. সম্যগ্ মিথ্যাদৃষ্টি বা মিশ্রদৃষ্টি,
৪. অবিরত সম্যগ্দৃষ্টি,
৫. দেশ বিরতি,
৬. অপ্রমত্ত সংযত,
৭. অপ্রমত্ত সংযত,
৮. নিবৃত্তি বা অপূর্বকরণ,
৯. অনিবৃত্তিবাদৰ-সম্পরায়,
১০. সূক্ষ্ম সম্পরায়,
১১. উপশান্ত-কৰ্মায়-বীতরাগ-ছন্দস্থ,
১২. ক্ষীণকায়-বীতরাগ-ছন্দস্থ,
১৩. সযোগি কেবলি,
১৪. অযোগি কেবলি।

গুরু বাহ্য ভয়ে এস্তে এদের আলোচনা করা হলো না। অন্যত্র এদের আলোচনা করার ইচ্ছে রইলো।

(৫) পুণ্যঃ

পুণ্য পঞ্চম তত্ত্ব। পুণ্য শুভফলের পরিচায়ক। কায়-মনো-বাক্যে শুভ কর্ম সম্পাদন করলে ফল সুখদায়ক হয়। তাকে পুণ্য বলে। সাধারণতঃ অন্নাদি দানে, শয্যাদি দানে, শুভ সংকলনের দ্বারা এবং দেব ও গরুর পূজাদি দ্বারা শুভকর্মের বন্ধ হয়। তাতে শারীরিক ও মানসিক, যশ, ধন-সম্পত্তি প্রভৃতি শুভ ফল পাওয়া যায়।

সুহ-পরিণামো পুণ্যং অসুহো পাবো তি হবদি জীবম্ভস।
দোষহং পোগ্গলমত্তো ভাবো কম্মতণ পত্তো॥।

আমার শুভ পরিণতি হলো পুণ্য এবং অশুভ পরিণতি হলো পাপ। এ মন্ত্র শুণে ও আব আমার সাহিত যোভাবে সংলিঙ্গ হয়, তার ফলে কর্ম শুভ বা অশুভ হয়।

রাগো জন্ম পদেখে অগুকংপা সংসীলে য পরিণামে।

চিন্ত হি গাধি কল্পসং পুঁঁজং জীবন্মস আসবদি।।

(পঞ্চাঙ্গিকায় ১৩৫)

‘আমা যদি সম্বৃক্ত চারিত্রে আসতে থাকে যার পরিণাম অনুকম্পার্মিতি চিন্তের কাল্পন্য (মলিনতা) যাতে থাকে না, জীবের পুণ্য সৈথালে প্রযোহিত হয়।

(৩) পাপ :

ষষ্ঠ তত্ত্ব পাপও কর্মের সাহিত যুক্ত। পুরোহিৎ হলো পাপ। যে কারণে তত্ত্বকল পাত্রো যায়, তার বিপরীত হলো পাপ হয়। পাপ কর্মের বক্ত হয় জীবহিত্বা, নিষ্ঠাকর্ত্ত্ব, দৌর্য, অবস্থাচর্য, আসঙ্গি, দ্রোণ্ধ, মান, যায়, লোভ প্রভৃতি অশুভ প্রভৃতির দ্বারা। পাপকর্মের ফলে নানাপ্রকার রোগ, তির্যক যোনিতে জয়গ্রহণ, নরকবাস, দারিদ্র্য, দুঃখ-কষ্ট প্রভৃতি নানা প্রকার অশুভ ফল পাত্রো যায়। এই পাপকর্মহেতু আমার বিকাশ না হওয়ায় অনঙ্গকাল যাবৎ জীব সংসারে ধূরতে বাধ্য হয়।

চরিমা পমাদ-বহুলা কালুম্বসং লোলদা য বিসংগ্রহু।
পর-পরিদৰ্শয-বাদে পাৰম্পৰ য আসবৎ কুণ্ডি।।

(পঞ্চাঙ্গিকায় ১৩১)

যদি জীবের কর্ম প্রমাদপূর্ণ মলিন ইত্ত্বিয়াদিচক্ষল পরপীড়ন বা অপ্রয়োগ সম্পর্কে অগত কথন হয়, তাহলে জীবের ঘোষণা পাপ প্রযাহিত হয়।।

পুণ্য ও পাপ আমলে বাস্তোই প্রকারভেদ। সেজন্য অনেকে বাস্তো ঘোষণা করেন।

(৭) সংবর :

যাত্রা কর্মকে নিরোধ করে, তাকে সংবর বলে। জীবের যে সকল কাজের ফলে কর্মের আঘাতের নিরোধ হয়, তাকে সংবর বলে। সংবর আঘাতের বিপরীত শর্ম।

জন্মসং জন্ম খলু পুঁঁজং জোগো পাৰং চ গাধি বিৰদম্প্র।

সংবরণং ত্ত স তদা সুহাসহকদ্মস।।

(পঞ্চাঙ্গিকায় ১৪০)

যোগীর যদি কোন এক যুহুর্তে পুণ্য বা পাপ কর্ম মানেতে উপস্থিত না হয়, সেই

যুহুর্ত যোগী পুরুষ তাল ও অন্দ কর্মের সংবর লাভ করে।

মানুষের কর্মফলের সম্পূর্ণ বিনাশ হওয়া যদিও প্রথম অবস্থায় সম্ভব নয়, তথাপি
জীব কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করবে।

বিজহতি ন হি সন্তাং প্রত্যয়াঃ পূর্ববন্ধাঃ

সময়মনুসরত্ত্বে যদ্যপি দ্রব্যরূপাঃ।

তদপি সকল-রাগ-দ্বেষ-মোহ-ব্যুদাসাদ्

অবতরতি ন জাতু জ্ঞানিনঃ কর্মবন্ধাঃ॥

(সময়-সার-কলাপ ৫।৬)

‘অতীতে আত্মার সহিত সংঘটিত কর্ম যদিও সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে না এবং
যদিও পরিণত অবস্থায় সে দ্রব্যরূপ গ্রহণ করে, তথাপি সকল প্রকার রাগ, দ্বেষ, মোহ,
আসক্তি প্রভৃতি হতে মুক্ত হলে কর্মবন্ধন জ্ঞানীর প্রতি পতিত হয় না’।

আসলে কায়-মনো-বাক্যের দ্বারা সংযম, শৌচ, সত্য, তপস্যা, শুভ্যান, অশুভ
কর্ম থেকে বিরতি, ক্ষমা, কোমলতা, নির্লাভতা, ইচ্ছার নিরোধ প্রভৃতি সদগুণের পালন
দ্বারা সংবর সাধিত হয়।

ভাবনা সংবর দ্বারা কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সেই ভাবনা সংবর হলো
পঞ্চমহাত্ম, পঞ্চসমিতি, ত্রিগুণ্পতি, দশ যতিধর্ম, দ্বাদশ অনুপ্রেক্ষা, দ্বাবিংশতি পরীসহ-
জয় এবং চারিত্র।

(৮) নির্জরা :

পূর্ববন্ধ কর্ম থেকে আত্মাকে পৃথক করাকে নির্জরা বলে। সংক্ষেপে কর্মক্ষয় করাকে
নির্জরা কহে। তপস্যার দ্বারা নির্জরা সাধিত হয় (তপসা নির্জরা চ।। তত্ত্বার্থসূত্র ৯।৩)।

সংবর-জোগেহি জুদো তবেহি জো চিঠ্ঠদে বস্থবিহেহিং।

কম্মাণং নিজ্জরণং বলগাণং কুণদি সো নিয়দং।।

(পঞ্চাংকিকায় ১৪৪)

‘যে কর্মপ্রবাহের দ্বারা কর্মবন্ধন হয় এবং যিনি বল্লবিধ তপস্যার দ্বারা নিজেকে
ব্যাপ্ত রাখেন, তিনি নিশ্চয়ই অনেক কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারেন’।

তপস্যা দু’ প্রকার—বাহ্য ও আভ্যন্তর। বাহ্যিক আচারাদি পালনের দ্বারা যে তপস্যা
হয়, তাকে বাহ্যিক তপস্যা বলে। আর আত্মার বা আন্তরের শুদ্ধির জন্য যে তপস্যা সেটা
হলো আভ্যন্তর তপস্যা। বাহ্য তপস্যা ছ’টি— উপবাস, অঙ্গাহার, রসত্যাগ (ঘৃত, তৈল,
দুৰ্ঘ, দধি, গুড়, ভাজা খাদ্য এ পাঁচটি বিকৃতরস ও মদ্য, মাংস, মাখন ও মধু এ চারটি
মহাবিকৃতরস), কায়ক্লেশ, ইচ্ছানিরোধ ও শরীর সংকোচিত করে নির্জনস্থানে উপবেশন।

আজাতের তপস্যাও হলো ছাঁচি—প্রাণিচত নিয়ম, বৈষ্ণবত, শাধাৰণ, অৱগত থাল।
নীচে চিত্রের সাথ্যে এন্টে সম্পর্ক দেখন হচ্ছে।

নির্জন

বাষ	আজাতৰ
১. উপবাস	১. আয়চিত
২. অগ্রাহ	২. বিনয়
৩. ইঙ্গ-নিরোধ	৩. বৈয়াবৃত্ত
৪. রসতা঳া	৪. শাধাৰণ
(ক) বিষ্ণুজন্ম—সৃষ্টি, তৈল, দুর্দু	৫. শুণ্ড
দামি, উড়, ভাজা, খাদ্য—এ	৬. ধান
৭. কায়ক্রেশ	৭. পাঞ্চটি বিহুতোষ।
৮. উপবেশন	(ব) মহাবিষ্ণুত্বস—মৃদ্ধ, মাঝস, মাঝি, উড়, ভাজা, খাদ্য—এ চৰাটি মহাবিষ্ণুত্বস।

মুক্তি হওয়ানক মোক্ত বলে। সকল প্রকার কৰ্মবন্ধন কৰে জীবনধাৰণ বৈবাহিক হৈতে হওয়ানকে মোক্ত। (তত্ত্বার্থন্ত্র ১০১২)

‘কৰ্ম-বন্ধনেৰ কাৰণগুলোৱ ক্ষয় ও নিৰ্জনৰ মাধ্যমে সকল প্ৰকাৰ কৰ্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ানক মোক্ত বলে।’ (পঞ্চাত্তিকৰণ ১৫০)

নিৰ্বাণ আপ্ত হ্য। তা থেকে নিষ্কাৰণ।
তো সংবৰণেৰ ভূমি নিষ্কৰণমণ্ডো য সৰবৰক্ষমাণি।
বৰগদেৰোডেল্লেনা মুয়দি ভৱ লেন সো মোক্তৰো। (পঞ্চাত্তিকৰণ ১৫০)
আপ্ত হ্য সংবৰণ আপ্ত হ্য সম্মত কৰ্ম থেকে মুক্ত হও এৰ বেলীয়, আৰু
প্ৰত্তি কৰ্ম বন্ধন তাগ কৰে সংবৰণ পৰিত্যাগ কৰে তথন তাকে মোক্ত বলে।

১৮। জৈনন্মতে মুক্তি পৰাৰ উপাৰ কি?

জৈন দৰ্শন মতে জীৱ যদি ত্ৰিপুৰুষ, ত্ৰিশুলি, পঞ্চমুণ্ডি সঙ্গৰ্দশ প্ৰকাৰ সহয় প্ৰত্তি
পালন কৰে তহলৈ মুক্তি পেতে পাৰে। এ সকল পালন কৰতে হলো পৰ্য মহাত্ম, পৰ্যাতিধৰ্ম
ও ধৰ্মশ ভাৰো প্ৰত্তিৰ ধাৰা কৰে, মন ও বাকাকে পৰিচালিত কৰতে হয়।
এৰং তাৰ ফলে মোক্ষসাধনমাণৰ সুবিধে হৰে। জৈন সাধুগণ মুক্তি পৰার জন্ম এগোলোৱ
পালন কৰে থাকেন।

১৯। জৈন জীৱনধাৰা কি? সাধু-সাক্ষী ও আৰক্ষ-আৰিকাৰ জীৱনধাৰাই যা কি?

জৈনগণ তাদেৱ ধৰ্ম প্ৰাচাৱেৰ জন্ম চৰ্তুৰিধ সংয় সংয়কে তৈৰ্থত বলা হ্য। যাঁৰা এই চৰ্তুৰিধ সংয়
সাধনী, আৰক ও আৰিকা। এই চৰ্তুৰিধ সংয়কে তৈৰ্থত কৰেন্তে, তাদেৱকে তৈৰ্থক বলে।

এই চৰ্তুৰিধ সংয়েৰ মধ্যে সাধুগণ শ্ৰেষ্ঠ। ধাৰা গৃহ তাগ কৰে তিঙ্গু জীৱন
স্থাপন কৰে জৈন ধৰ্মকে নিয়মাবদ্ধ কৰেন্তে, তাদেৱকে তৈৰ্থক বলে।
অপূৰ্ব তপস্যাদীনি পৰিপাক্ষুমায়তঃ।। ১৪।।
শুধু অকালেৰ্পি প্ৰথমাত্মে তথা কৰ্মাণি সৌহান্ত।। ১৫।।
অনুভূত কৰ্মকৰ্ম বিপৰক-আপুনুভূতান।
প্ৰথমাত্মেৰ সৰ্বৰ্যাঙ্গ বিতীয়া তু তপস্যিনাম।। ১৬।।

শাশ্বতের জেনপর্ম

‘ইঙ্গিয়ালি সময়পূর্বক, রাগ-ব্রহ্মণ ক্ষয়ে চ।

অহিসমা চ তৃতীয়নমৃতস্থায় কঢ়াতে।।

‘ইঙ্গিয়ালি সময়পূর্বক, রাগ-ব্রহ্মণ ক্ষয়ে চ।

অহিসমা করে মানব অনুত্ত প্রাণ হয় (অর্থাৎ এ সকল দ্বারা মানুষ মৃত্যি পান)।।

গীতারও আহ—

অহিসমা সমতা দৃষ্টিস্ত্রপো দান যথোবশঃ।

অহিসমা ত্বষ্ট ভাবা তৃতীয়ন মত এস পথগবিধঃ।। (১০৫)

অহিসমা, সমতা, তৃষ্ণি, তপ, দান, যশ ও অশ—জীবের এ সকল পথক

অব আমা হতেই হয়েছ।

অবস্থা সর্বভূতাং মৌঝং করশ এবচ।

নিম্মো নিরহক্ষরঃ সমাদঃঘসুখঃ ক্ষমী।। (১২১৩)

স্বর্বকর প্রকার প্রাণিতে যাব বিষবৈনদগ্নি, সমান মৌতীব ও ক্ষণা আজ এবং যে মুক্তিইন ও নিরহক্ষর, অনের সুখ ও দুঃখে সমবেদী ও যে ক্ষমাশীল (সে আমার পিয়)।।

অমনিত্বাদিত্বহিসা ক্ষাত্তিরজব্যম।

অঞ্চল অঞ্চল আট্টযোগ্যন লোচং স্ত্রেমায়বিনিগ্রহঃ।। (১৩৭)

‘অস্ত্রঘায়ীনতা, দৃষ্টিহনতা, অধিসা, ক্ষমা, ঝুঁতুতা (সরলতা), উরস্বে, প্রচিতি, কৌর্য-দৃঢ়তা এবং অঞ্চলিহঁ—এগুলো জনসাধক বলে অভিহিত।

অঞ্চল অঞ্চল আহিসা সত্ত্বমন্দেবঙ্গাঃ শান্তিগৃহণম।।

অঞ্চল অঞ্চল দ্বা দৃতে খলেপত্র মাদবিং হীরাপলম।। (১৬২)

অঞ্চল অঞ্চল আহিসা, সত্তা, অঙ্গোধ, শান্তি, পরিছয়েমৰী না হওয়া, সব প্রাণিতে দ্বা,

অলোভতা, মৃততা, লজ্জা ও অচাপন্ত—এগুলো মানবের বৃত্তি।

অঞ্চল অঞ্চল দ্বে-বিজগুর-গোল-পুজনঃ শোভামার্জব্য।।

অঞ্চল অঞ্চল দ্বা দায়ং নবিতেতি দ্বা চামাম বিভাতি।।

ব্রাক্ষা, মন ও দেহের দ্বারা কেন থাণিকে গীড়ন না করাই অহিসা এবং শরীর, মন

ও বাকের দ্বারা সকল জীবের আশ্চর হৃতা ব্যবহার করাই অহিসা।

মহাতরাতে শাপিগতে যুক্তি-তর্ক ও আখ্যাতের মাধ্যমে অহিসার প্রেষ্ঠ প্রতিপাদন

করা হয়েছে। এবিত্যে যুক্তি হলো—

কলাজীবিতঃ যঃ স্মঃ চেছেঃ কথ সোন্যঃ প্রয়ত্নেঃ।

দ্বান্তজীবিতঃ যঃ স্মঃ চেছেঃ ত পরম্পরি চিত্তেঃ।। (১২২৫৪) (২২)

যদ যদাখনি চেছেঃ ত পরম্পরি চিত্তেঃ।। (১২২৫৪) (২২)

‘মনি নিজে ব্যাঙ্গীবিত থবেতে ইচ্ছেকরেন, তিনিকি প্রকারে অন্যকে বধ করতে

গানেন। সৃতৰাঃ সন্মন নিজে যা যা সম্প্রান করবেন, অপরের ব্যাপারেও সেরাপ চিন্তা

করবেন।’

ত এ যুক্তির অমুকলে এক বাহী আহে মহাতারাতের শাপিপর্বে। ‘আজিন-তুলাধার’

উপখন। সে উপখন হতে জনা যায় যে বিন্দ তুলাধার আজলিকে সৃষ্টি

ধৰ্মত্ব সমবে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তাতে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে

অহিসাইজগতে পরম ধৰ্ম। আজল আজলি আনন্দিষ্ট ও ধৰ্মবৰ্তবৰ্দি ব্যোতুলাধারকে

ধৰ্ম বিষয়ে জিজেয় করলে তুলাধার বলেন—

আমোহণের ভূতনাম অজ্ঞাতোহৃষে বা পুনঃ।

যা বৃক্ষে স পুরো ধৰ্মসেন্দীবামি জাজলে।।

‘হে জাজলি মুনি, আগিগণকে হিসা না করে অথবা অহিসা পূর্বক যে জীবিকা

সদা বস্ত তিনিই ধৰ্ম জানেন।

ত্যজন ত্যজন যদা দায়ং নবিতেতি দ্বা চামাম বিভাতি।।

যদা নেষ্ঠিন মেষ্টি বৃক্ষ সম্পদাতে তদা।।

বৃক্ষ কোন লোক কাউর খেকেও ত করেন না এবং যখন কেউ বা এর থেকে

তখন সে ব্রহ্মপদ লাভ করতে পারেন।

যদা ন বৃক্ষতে তারং সর্বভূত্যে পাপবন্ধ।

কৰ্মা মনসা বাচ ব্যাপ সম্পদাতে তদা।।

‘মানুষ যথন কর্ম, মন ও বাচোর আরা প্রাণী সবকের অনিষ্ট সাধন না করে, তখন
সে ব্রহ্মাদ লাভ করতে পারে।’

অভয়ঃ সর্বভূতেভ্যঃ স প্রাপ্তোতি সদা মুনো॥

‘কেন প্রাণী কখনও কোন প্রকারেও কোন কিছু থেকে উত্তীর্থ হ্য না, সেই লোক
সর্বদাই কেন প্রাণী থেকে উত্তীর্থ ভোগ করে না।’

স সর্বযৌজ্ঞীজ্ঞানঃ প্রাপ্তোত্যত্যদক্ষিণাম্।

ন দৃতান্ত্ম আহিংসায় জ্ঞায়ান্বর্ণোষ্ঠি কশচ।।

‘বিনি জগতের সকল প্রাণীকে অভয়দান করণেন, তিনি সমস্ত যজ্ঞ করেই যেন অভয়
লাভ করেন। আগিগণের আহিংসা হতে পরম ধর্ম জগতে আর নেই।’

এজাপে তুলাধার বলতে লাগলেন যে পঙ্কগণকে বধ করে যে তৎক্ষণ কুরা হ্য তৎক্ষণ
বিদ্যুনীয়। মানুষ মানুষকে যে দাসরাপে ভোগ করে থাকে তাতে নিষ্ঠুরতার
গুরুচায়ক। তুলাধারের মতে কৃষিকার্য পাপজনক কারণ কর্ষণের দ্বারা যে দুর্মিদ্বৱ্য
কুরা হ্য, তাতে দুর্মিদ্বৱ্য হব আগীর বিবাশ হয়ে থাকে এবং সেই লাদলযুক্ত বৃষণগং
বহু কষ্ট পেতে থাকে। এর প্রত্যুত্তরে জাজলি বললেন—

কৃষ্ণ যামঃ প্রভবাতি ততস্তুমণি জীবসি।
পঙ্কতিশ্যেবধীভিষ্ম মৰ্ত্তা জীবতি বাণিজ।।

ততো যজ্ঞঃ প্রত্যুতি নাস্তিক্যামণি জন্মসি।

ন হি বৰ্তেন্দঃ লোকো বাৰ্তমুৎসৃজ্য কেবলান্ন।।

কুরু কুরু কার্যের ওপে অম হ্য, তাতে আগিও জীবন ধারণ এবং মানুষের
পত ও শস্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। সেই শস্য হতে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হ্য। আগী
নাস্তিকের কথা বললেন। মানুষ প্রথম জীবিকার উপর পরিত্যাগ করে বৈচে থাকত
পারে না।

এর উত্তরে তুলাধার বললেন যে যজ্ঞ করতে হলে নিষ্কাম পূর্বক যজ্ঞ করতে হ্য
পুরোহিতের কথনত যজমানদের প্রতিরোগ করবে না। এবং যজ্ঞ কেন প্রকার প্রাণী
হ্যাকুরা চলবে না। এভাবে তুলাধার আশ্মাগ জাজলির কাছে প্রমাণ করলেন যে জগতে
সর্বত্তে দৰ্ম্ম ও আগিগণের প্রতি আহিংসাই হলো শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

মহাভারতের বনগৰ্বে (২০৩-২০৮ অধ্যায়ে) মার্কণ্ডেয় ও ব্যাধের বনথাপকথন
আধ্যমে আহিংসা ধর্ম প্রচারিত হয়েছে।

কর্মবর্হিসাং মাঃ হি ধৰ্মাঞ্চ মনুরবীৰ্ণ।

সর্বকৰ্মবর্হিসাং মাঃ হি ধৰ্মাঞ্চ মনুরবীৰ্ণ। ।।৭।।

‘ধৰ্মাঞ্চ মনু বলেছেন যে কেন কাজেই হিসা করবে না। কিন্তু মানুষ মাঙ্স খাবার
ইচ্ছেতেই যাজ্ঞের বেদীর বাইরে পতেহিসা করে থাকে।’

তথ্যঃ প্রমাণতঃ কার্মো ধৰ্মঃ স্বশ্রো বিজ্ঞানতা।

আহিংসা সর্বভূতেভ্যো ধৰ্মেতো আয়ৌ মত। ।।৮।।

‘অতএব প্রাজ্ঞ লোক প্রয়াণ অশুণারেই সুস্ম ধৰ্ম আচরণ করে থাকে। কোন
প্রাণীর প্রতি হিসা না করাই হলো সমস্ত ধৰ্ম থেকে প্রোট।’

বৃথা মাঙ্গানি খাদতি নেষ ধৰ্মঃ প্রশংস্যতে ।।৯।।

যদি কোন ফালের আশায় মানুষ বৃক ও যুপ জ্বেল করে এবং বৃথা মাঙ্গ খায়, তা
হলে সে ধর্ম প্রশংস্য নয়।।

সুরা ঘৎস্যো যথঃমাঃসমাসৰ কৃশ্মোনুম্ভ।

ধৰ্মতঃ প্রবৰ্তিতং যেতেন্দেত্ব বেদেন্দু কৃত্যত্বে।

কাম-মোহচ লোভাত লোভামেত প্রবল্লিত্য ।।১১।।

সুরা, মাছ, মধু, মাঃস, মদ, চিটিরি এগুলো খৃত লোকেরা যজ্ঞে প্রবৰ্তিত করেছে।
বিক্ষ বেদে এগুলোর কেন কঞ্জন নেই। কামনা, মোহ এবং লোভবশতঃ খৃত লোকেরা
এ চাক্ষল্য প্রবাশ করেছে।

মহাভারতের অনুসাসন পার্বের ১০০ অধ্যায়ে দানবর্মে মাংসভক্ষণের নিষেধকালে
আহিংসা ধনের প্রেতে প্রতিগ্রান করা হয়েছে।

শ্বাসো রাজ্ঞাম মেৰাঃ প্রশংস্যতি মহামতে।

আহিংসা লক্ষণঃ ধৰ্মঃ নেদ-প্রায়ণ-দৰ্শনাঃ ।।১৩।।

‘যুদ্ধিষ্ঠির বললেন), হে মহামতি পিতামহ দেবগণ, খৰিগণ ও আশাগ্রহ বেদের
প্রায়ণ দেখে আহিংসা রাপ ধৰ্মের প্রশংসা করেছে।’

কুমাণ মনুজঃ কুর্বন হিসাং পার্বিষৎসত্ত্বম।

বাচাচ মনসা দৈব কথঃ দৃংখ্যঃ প্রযুচ্যতে ।।১৪।।

‘ହେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶ୍ରୋଷେ, ମନୁସ ବାବ୍ୟ, ମନ, କର୍ମ ଓ ବଧ ଦ୍ୱାରା ଆଣିଗଲେର ହିଂସା କାରେ କି
ପ୍ରକାରେ ପାପ ଥେକେ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ?’

ଆହିସା ପରମୀ ଧର୍ମର୍ଥଥାହିଂସା ପରମ ତଥଃ ।

ଆହିସାଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟେର ତୁଳ୍ୟ ।’ ଏଇଅହିସା ପରମ ଧର୍ମ, ଆହିସାଇ ପରମ ତଥଃ, ଏବଂ
ଏଇ ପରବତୀ ଅଧ୍ୟୟେ (୧୦୧) ଆହିସା ଧର୍ମେର ଫଳ ସଥେକେ ଅଭିମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
ଦୟାବତାଦିମେ ଲୋକାଃ ପରେ ଚାପି ତପସିମ୍ବୟ ।

ଆହିସାଲକ୍ଷ୍ମେ ଧର୍ମହିତି ଧର୍ମବିଦୋ ବିଦୁଃ ॥୧୦ ॥

ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକ ଦୟାନୁ ତପସିଗରେ ପରେକେ ସୁଖଜଳକ ହୁୟେ ଥାକୁ । କାରଣ
ଧର୍ମଜ୍ଞଙ୍କ ମନେ କରେନ ଯେ ଆହିସାଇ ପରମ ଧର୍ମ ।

ଆହିସା ପରମୋ ଧର୍ମର୍ଥଥାହିଂସା ପରୋ ଦୟଃ ।

ଆହିସା ପରମ ଦାନମହିଂସା ପରମ ତଥଃ । । ୩୭ ।

ଆହିସା ପରମୋ ଯଜ୍ଞର୍ଥଥାହିଂସା ପରମ ସୁଖ୍ୟ ।

ଆହିସା ପରମ ଧର୍ମ, ଆହିସା ଉତ୍ତମ ଦମନ, ଆହିସା ପରମ ଦାନେର ତୁଳ୍ୟ, ଏବଂ ଆହିସାଇ
ପରମ ତଥଃ ।

ଆହିସା ପ୍ରଥମ ସଜ୍ଜେବରାପ, ଆହିସା ଉତ୍ତମ ଫଳସରାପ, ଆହିସାଇ ପରମ ମିତ୍ର, ଆହିସାଇ
ଉତ୍ତମ ସୁଖଦାତା । ଆହିସାଇ ପରମ ସତ୍ୟ, ଏବଂ ଆହିସା ଶାନ୍ତିଜାଗନେର ତୁଳ୍ୟ ।

ଆହିସା ପରମୀ ସର୍ବଧର୍ମୀ ବା ଦାନଃ ସର୍ବତୀର୍ଥୟ ଆଶ୍ଵତ୍ମ ।

‘ସବଦାନଫଳଃ ବାପି ଲୈତତୁଳ୍ୟାହିସଯା । । ୩୯ ।

‘ସକଳ ଯଜ୍ଞେ ଯେ ଦାନ, ସକଳ ତୀର୍ଥେ ଯେ ଶାନ, ଅଥବା ସକଳ ଦାନେର ଯେ ଫଳ, ତା
ମହାତାରତେର ଆରାତ ନାନା ହୁଲେ ଆହିସା ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆଲୋଚନା ଆହେ । ସାହ୍ୟ ଆ
ଧିକ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ।’

ସାକଳେ ଆହିସାର ତୁଳ୍ୟ ନାହିଁ ।

ଆଧିକ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ନିଷ୍ପର୍ଯ୍ୟାଜନ ।

ପରବତୀ କାଳେତେ ଆହିସାକେ ନାନାତାବେ ପ୍ରତିର୍ଥିତ କରାର ଜଳ ନାନା ମୁକ୍ତି ଯ
ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟରେ ସାହ୍ୟ ନେଇଯା ହେଁଥେ । ଯେମନ ହେମତ୍ର ଯୋଗଶାନ୍ତେ ଆହିସାକେ ମାତର ସଂଗେ
ତୁଳନା କରେହେ ।

মাতেব সর্বভূতানাম অহিংসা হিতকারিণী।

অহিংসেব হি সংসারমরাবমৃত-সারণিঃ ॥ (২।৫০)

অহিংসা দুঃখ-দাবাগ্নি-প্রাবৃষ্ণে-স্থনাবলী।

ভব-অমিরগার্তানাম অহিংসা পরমৌষধী। (২।৫১)

‘অহিংসা মাতার ন্যায় সমস্ত প্রাণীর হিতকারিণী, সংসাররূপ মরুভূমিতে অহিংসা অমৃতধারা বহন করে আনে। দুঃখরূপ দাবাগ্নিতে অহিংসা বর্ণমুখর মেঘের মত, পুনঃ পুনঃ আবর্তনকারী রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে অহিংসা পরম ঔষধের কাজ করে’।

শ্রীমত্তাগবতে অহিংসার যে প্রস্তুতি আছে তা প্রাণিধানযোগ্য।

যে ত্বনেবংবিদো সন্তঃ স্তৰ্বাঃ সদাভিমানিনঃ।

পশ্চন্ত দ্রুহষ্টি বিশ্রবাঃ প্রেত্য খাদান্তি তে চ তান্ঃ ॥ (১।৫।১৪)

‘এরূপ শাস্ত্রবহস্যে অনভিজ্ঞ, অবিনয়ী, স্বয়ং সাধু বলে অভিমানী এবং আত্মকার্যে বিশ্বাসী যে সকল অসাধু ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ করার জন্য যজ্ঞ করার ছলে পশুগণকে বধ করে, নিহত পশুগণ পরলোকে গমন করে সে সকল অসাধু ব্যক্তিকে ভক্ষণ করে থাকে।’

বিষ্ণুঃ পরকায়েষু স্বাত্মানং হরিমীশ্বরম্।

মৃতকে সানুবঙ্গো স্মিন্ব বদ্ধমেহাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ (১।৫।১৫)

‘সেই অসাধু ব্যক্তিগণ এই মরণশীল দেহে ও পুত্রকল্পাদিতে আসত্ত হয়ে এদের পোবণের জন্য পশুহিংসা করে নিজের আত্মাকে, সেই হিংসিত পশুর দেহাহিত আত্মাকে, এবং উভয় দেহে নিয়ন্ত্রণাপে বিদ্যমান শ্রীহরিকে দ্বেষ করে অধঃপতিত হয়ে থাকে।’

এ সকল শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ ছাড়া ঐতিহাসিক দৃষ্টি থেকেও বোঝা যায় যে অহিংসা ভারতীয় ধর্মীয় সংস্কৃতির সংগে ও তপ্রোতভাবে জড়িত আছে। এখানে একটি ইতিহাসের নজির দেওয়া হচ্ছে। জয়সিংহের পর কুমারপাল গুজরাটে রাজা হলেন। তিনি ১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জৈনধর্মে দীক্ষিত হবার পর তিনি সমগ্র গুজরাটকে জৈনরাজ্যে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি নিজে মৃগয়া বিহার পরিত্যাগ করেছিলেন এবং রাজ্যে প্রাণিহত্যা, মাংসভক্ষণ, মদ্যপান, দৃতক্রীড়া, প্রাণীর লড়াই, বাজী প্রভৃতি নিষিদ্ধ করেছিলেন। ইতিহাসে এরকম নজীর আরও অনেক প্রাওয়া যায়।

(২) সত্য

পঞ্চমহাব্রতের দ্বিতীয় হলো সত্য। মানুষ যাতে কোন অবস্থাতেই অসত্য ভাষণ না করে সে দিকে লক্ষ্য রাখা মানুষমাত্রেই কর্তব্য। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে, কারণে অকারণে, মানুষ প্রতিনিয়ত মিথ্যা আচরণ করছে, তার ফলে মানুষের আত্মবিশ্বাস ক্রমশঃ নষ্ট

হচ্ছে কলে হচ্ছ, হেষ, কল্প, বানবিমসবাদ, হিসা প্রভৃতি প্রতিনিয়ত যানবাকে অঙ্গীকৃত করছে। সত্ত্বাতম সত্ত্ব-আচরণ যানবাকে এসব থেকে পরিআশ করবে। যানব যান সর্বদা সত্ত্ব-ভাষণ, সত্ত্ব-আচরণ, ন্যায়-নিয়ম-নিষ্ঠা পূর্বক জীবন যাপন করে, তা হলে হিসা, লোড, ক্রাঁশ, তা প্রতিটি হতে নিজেকে আনেক দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে। কেবল সাধুদের পক্ষে শান্তিকে প্রতিনিয়ত সত্ত্ব-আচরণ করা কার্তব্য। কেবল সাধুদের পক্ষেই ন্যায়-যানবকে প্রতিনিয়ত সত্ত্ব-আচরণ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা ডাইজ সাধুর গৃহীয়াও যাতে কাম-চন্দনো বাবুকে সত্ত্ব-আচরণ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা ডাইজ সেজন্য সাতের অভিযা শাস্ত্রে বহু কীর্তি হয়েছে।

(৫) পূর্বপাদু সত্ত্বমূল্য দৃষ্টিয়ে। (সৈশ ১৫)

‘হে পূর্ব দেব, হিন্দুর পাত্রের ঘৰা সাতের মুখ ঢাকা পড়ে আছে সত্ত্ব পূর্বগালনকৰীদের দৃষ্টির জন্য তুমি তা আবরণশূণ্য কর।’

(৬) অটৌর্ম
তৃতীয় পঞ্চমহত্ত্ব হলো অটৌর্ম। অটৌর্ম শব্দের সাধারণ অর্থ হলো ‘ঐরিনা’। অধিকারী কর্তৃক প্রদত্ত হলে কোন দ্বারাই কোনরাপভাবে এহসা করা উচিত নয়। আসলকে নকল, নকলকে আসল, জালিয়াতি, জোচুরি, নিষিদ্ধ বস্তুর ব্যবসা প্রতি অটৌর্মের অঙ্গীকৃত। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অটৌর্ম বৃত্ত অবশ্য পালনীয়। যানবাকে প্রতিনিয়ত স্মরণ রাখতে হবে যে সে যেন কোন প্রকারেই অন্যায়ভাবে কারো কোন ধনের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি না রাখে। যন্ত্র (৪২৫-৫৬) যাতে

যোন্যথা সত্ত্বাত্মানমন্থা সংস্কৃতাযাতে ।

স পাপকুল্মো লোকে স্তেন আঘাপয়ারকঃ।।

‘যে নিজে যা (অতি-কুল-কর্ম প্রভৃতিতে) তা যদি সাধুগণের নিকট প্রকাশ করে, তাহলে সমাজে সে পাপকারী, সেই যথার্থ চের, কারণ সে আঘাপয়োগনকৰ্মী। বাচ্যার্থ নিয়তাঃ সর্ব বাঙ্গ-বিনিঃস্তাঃ।।

তাঁর পূর্বে যানবকৰী পূর্বমূল্যের সকল বিষয়ে আসাক্ষি উৎপন্ন হয়। আসাক্ষি হতে কামনা জয়ে এবং কামনা কোনরাপে প্রতিহত হলে তা হতে ক্রোধের উদ্বেক হয়। ক্রোধ হতে কার্মকার্ম বিবেচনা দূরীভূত হয়, তা থেকে স্মৃতিশূণ্য জ্ঞানে স্মৃতিশূণ্য হতে বৃক্ষিনাশ এবং বৃক্ষিনাশ থেকে যানব যুক্ত্যাত্মা হয়ে থাকে।’

পরিগ্রহ থেকে লোড এবং লোড থেকে বিবাদ হওয়ার সত্ত্বান্বাদকায় জ্ঞেনশব্দে, অপরিগ্রহ এত পালন করার দিক বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

কিছু পদার্থের নির্গমন হয়েছে। যে বাতি অসত্ত ঘৰা সে বাব্য অপহৃণ করে, সে সব কিছু ঘৰি করে থাকে।’

(৭) বক্তৃব
চতুর্থ যথৰতব্রচর্চাকি সাধু বা সাক্ষী, কি শ্রাবক বা শ্রাবিকা, প্রত্যেকেই এক

পালন করা বিধেয়। ‘সংযমঃ খন্দ জীবন্ম’। সংযমই হলো জীবন্ম। যদি ব্রহ্মচর্চিতি অবলম্বন পূর্বক জীবনধারণ করে তাহলে তাৰ কারিক, বাচ্য ও সনদিক উপত্যকাখন হব। তাৰ ফলে আধ্যাত্মিক উন্নতিও হবে। হিন্দু জ্ঞেন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে এই শীল অর্থাৎ চরিতাকে অনুযায়ী সর্বশেষ সর্বশেষ উপাদান বালে বৰ্ণনা কৰা হয়েছে। ঘৰা গৃহী আদেৱ পক্ষে পূর্বৰস্তর্য পালন কৰা সত্ত্ববন্য। বিষ্ণু পৰিমিত ব্ৰহ্মত্ব পালন কেন অনুবিষ্ট নেই। সাধুদের পক্ষে ইহু অবশ্য পালনীয়। অস্তুবৰ্তৰ মাধুমে যানব সংবত চৰিত্রগঠন পূর্বক আঘোন্নতি লাভ কৰবো।

(৮) অপরিগ্রহ

পঞ্চমহত্ত্ব হলো অপরিগ্রহ। সাধারণভাবে অপরিগ্রহের অর্থ হলো কোন প্রকার পরিগ্রহ না রাখা, অর্থাৎ স্বার্ব-অস্ত্রাব, ধন-ধান্য দুষ্পৰ্যাপ্তি না রাখা। পরিগ্রহ শব্দের ঘৰা সৰ্ব প্রকারের গৰহণ বা সংক্ষয় ও তাৰ প্রতি আসাক্ষি বৃক্ষিয়ে থাকে (গীরিঃ সৰ্বতঃ সাবল্যেন বা গৃহাক্ষতি ইতি পরিগ্রহঃ)। প্রতিনিয়ত যানব তাৰ সংকলিত নিষিদ্ধ সীমাব অতিক্রম ধনসম্পত্তি দুষ্পৰ্যাপ্তি প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে তাৰ উভয়োভূত বৃক্ষিক চেষ্টা কৰছে। ফলে যানবের লোভ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ লোভ হতে ক্রমশঃ কাম, দেশম, মোহ মদ ও মাংসমূরের উৎপত্তি।

ধীয়তো বিষয়ান্ত পৃংসঃ সদস্তেষুপজ্ঞায়তে।
সম্বাদ সংজ্ঞায়তে কামঃ কামাদ ক্রোধে উৎপত্তি।

ক্রোধদ উভাতি সম্মাহঃ সম্মোহঃ স্মৃতি-বিদ্যমঃ।

স্মৃতিঅংশদ স্মৃদি নাশে স্মৃক্ষিনাশাঃ প্রশংস্যাতি।।

(জীতা ২৭২-৩০)

বিষয় যানবকৰী পূর্বমূল্যের সকল বিষয়ে আসাক্ষি উৎপন্ন হয়। আসাক্ষি হতে কামনা জয়ে এবং কামনা কোনরাপে প্রতিহত হলে তা হতে ক্রোধের উদ্বেক হয়। ক্রোধ হতে কার্মকার্ম বিবেচনা দূরীভূত হয়, তা থেকে স্মৃতিশূণ্য জ্ঞানে স্মৃতিশূণ্য হতে বৃক্ষিনাশ এবং বৃক্ষিনাশ থেকে যানব যুক্ত্যাত্মা হয়ে থাকে।’

পরিগ্রহ থেকে লোড এবং লোড থেকে বিবাদ হওয়ার ক্ষেত্ৰে সত্ত্বান্বাদকায় জ্ঞেনশব্দে, অপরিগ্রহ এত পালন কৰার দিক বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

এ সকল অনুসরণ কৰা বিধেয়। তাহলে তাৰ গৃহী হয়েও সাধুদের পক্ষেও এ সকল অনুসরণ কৰা বিধেয়। তাৰ গৃহী হয়েও সাধুদের অনেকে কিছু অধিকারী আঘোন্নতি লাভ কৰে থাকে।

প্রয়োজনের জৈবনথর্ম

৬০

অমতা, ক্ষমা, সত্তা, সময়মত তপস্যা, শৌচ, আহিংসা, নিষ্পত্তি, আগ, প্রতিমাসা প্রভৃতি
ব্যক্তিগত অধিকারী হতে পারে এবং এর ধারা তাদের আয়োজন করবে।

২. ক্ষিম

সাধু ও সাধীদের অবশ্য পালনীয় বিবৃতি। সমগ্ৰ দৰ্শন, সমগ্ৰ জ্ঞান ও সম্পূর্ণ
চারিত্বকে সাক্ষীত্ব কৰিব বা বৃত্তান্ত বা উৎপত্তি বলে। তিৰত্বের আৱাধনা মোক্ষবন্দনের
উপর। এদের ব্যথাযথ বিভাগ প্রথমে দেখান হচ্ছে।

ত্রিপুষ্ট

(৩) সমাদ্ব চারিত্ব

সমাধ দৰ্শন	সমাধ জ্ঞান	সমাদ্ব চারিত্ব
১. বিৰক্ত মৃষ্টি	১. বিৰক্ত মৃষ্টি	১. সৰ্বত্বাগ
২. ব্যবহৰ	২. ব্যবহৰ	২. অংশত্যাগ
৩. সমাধ দৰ্শন	৩. অবিধিজ্ঞান	৩. পক্ষমহৱত
৪. নিষ্ঠচ্যুত্যমণ্ডন	৪. নিষ্ঠচ্যুত্যমণ্ডন	৪. পক্ষমহৱত
৫. কৈবল্যজ্ঞান	৫. কৈবল্যজ্ঞান	৫. কৈবল্যজ্ঞান

৩. অতিজ্ঞান—শব্দ ও অবৈর্তন পাৰমপৰিক জ্ঞানকে অতিজ্ঞান কৰয়।

৪. অতিজ্ঞান—এক নিৰ্দিষ্ট সীমাৰ মাঝে অবৈতন সমষ্টি কৰলৈ পদাৰ্থকে যে জ্ঞানেৰ
ধাৰা জানা যায় তাকে অবৈজ্ঞান বলো। ইয়াও আধিক জ্ঞান।

৫. মনঃপর্যায়জ্ঞান—বিশিষ্ট নিৰ্দিষ্ট সীমাৰ মাঝে হিত পৰিণামক মে জ্ঞানেৰ ধাৰা
জানা যায়, তাকে মনঃপর্যায়জ্ঞান বলো। ইয়াও আধিক জ্ঞান।

৬. কৈবল্যজ্ঞান—যে জ্ঞানেৰ ধাৰা বিশেষৰ সকল কৰ্মী ও অৱকৰ্মী পদাৰ্থেৰ ও তাদেৰ

উপ ও পৰ্যায় জানা যায়, তাকে কৈবল্যজ্ঞান বলো।

(৩) সমাদ্ব চারিত্ব :

১. সংযোগ সংযোগ, আগ ও শূদ্র আচৰণ প্ৰভৃতি চারিত্বকে সমাদ্ব চারিত্ব বলো। সমাধ
দৰ্শন ও সমাধ জ্ঞান উৎপন্ন না হলৈ সমাদ্ব চারিত্ব হয় না।

২. অতিজ্ঞান—সৰ্বত্বাগ ও অংশত্যাগ। সাধুগণ সৰ্বত্বাগ কৰবেন এবং
গৃহস্থগণ অংশত্যাগ কৰবেন।

৩. সংযোগ পক্ষমহৱত, পক্ষসমীকৃতি, ত্রিপুষ্টি, দশ ঘৃতিধৰ্ম, দশ ভাৰনা, সপ্তদশ প্রকাৰ

সংযোগ পক্ষমহৱত, পক্ষমহৱত, পক্ষমহৱত, পক্ষমহৱত, পক্ষমহৱত, পক্ষমহৱত,
জৈনগণতে এগুলো সমাধৰণৰূপে পালন না কৰলৈ চারিত্বেৰ পূৰ্ণৰূপে আৱাধনা কৰলৈ
অহিংসাহী হলো সে চারিত্ব বিকাশেৰ মূলতিতি।

৫. ত্রিপুষ্টি :

আধীনিক উগতি সাধনেৰ জন সাধু ও সাধীদেৰ বিপুলি পালন কৰা অবশ্য

কৰ্তৃত্ব। ত্রিপুষ্টি হলো—

১. বাগপুষ্টি—বাস্তোৱ সংযোগতা পালন,

২. কামপুষ্টি—শৰীৰত্বিয়াৰ সংযোগতা পালন,

৩. মানোপুষ্টি—মাদেৰ ত্রিয়াৰ সংযোগতা পালন।

৬. পক্ষসমীকৃতি :

অনুৱাপত্তাৰে পক্ষসমীকৃতি পালনীয়। সেগুলো হলো—

১. সৰ্বসমীকৃতি—গমনাগমনে সতৰ্কতা পালন,

২. আয়সমীকৃতি—ব্যথোপকথনে সতৰ্কতা পালন,

৩. এষগাসমীকৃতি—ডিক্ষা আগামে সতৰ্কতা পালন,

সমাধ দৰ্শনেৰ পৰ যে জ্ঞানেৰ উৎপন্ন হয়, তাকে সমাধ জ্ঞান পালন প্রকাৰ—নান্তি-জ্ঞান, অংতজ্ঞান,
নাহলে সমাধ জ্ঞান হয় না। সমাধ জ্ঞান পালন প্রকাৰ—নান্তি-জ্ঞান, অংতজ্ঞান, আবিধিজ্ঞান
মনঃপর্যায়জ্ঞান ও কৈবল্যজ্ঞান।

৪. মাতিজ্ঞান—চকুৰাদি ইত্যুক্তিৰ সংগৈ যানেৰ সংযোগেৰ ফলে মাতিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

৪. আদম মিকেশ সমিতি—আদমে ও অবস্থালে সর্করতা পালন।

৫. উৎসর্গ সমিতি—অলঘোনি আমে সর্করতা পালন।

৬. পুরুষ বিত্তিশৰ্ম :—জেন সাধু ও সাক্ষীগণ দ্বন্দ্বকার যতিশৰ্ম পালন করবেন। দশটি যতিশৰ্ম হলো—

জেন সাধু ও সাক্ষীগণ দ্বন্দ্বকার যতিশৰ্ম পালন করবেন। দশটি যতিশৰ্ম হলো—
ক্ষমা, মানব (=ন্যস্ত), আজৰ্ব (=সরলতা), নিলোত্তা, অকিঙ্কনতা, সত্তা, সংযম,
তপস্যা, শোচ ও ব্রহ্মত্ব।

৭. ধৰ্ম ভাবনা বা অনুপ্রোক্ষা :

জেন সাধু ও সাক্ষীগণ বাবোটি অনুপ্রোক্ষা সমধৰে সম্পূর্ণ সত্যজ্ঞ থাববেন। সেগুলো

হলো—

১. অনিত্য—এ সংসার অনিত্য।

২. আশৰণ—কৰ্ম বকল থেকে কেউ খাবতে পাওন না।

৩. সংসার—কৰ্ম বকল আমাদের সংসারাতঙ্গে আবদ্ধ বাধ্যতেচয়। নির্বাহই হলো

এর থেকে মুক্তি।

৪. একমত—ইহ ও পৱলোক আমারাই আমাদের কর্তা, ভোজা ও নিয়ন্তা।

৫. দুর্বল অনুভূতি বা পৃথক্কৰ্ম—দেহবা শৰীর ছাড়া সবকল পদাৰ্থ আমাদের থেকে পৃথক।

৬. অভিজ্ঞতা—শ্রীরের বহু অভিজ্ঞতা আঘাত পৃথক।

৭. আজৰ—পুণ্যেল আঘাত প্রাপ্তি এবং নতুন বকল প্রতিনিয়ত আঘাতে বকল

কৰছে।

৮. সংবৰ্ধ—কৰ্মপ্রাহ বধু কৰতে হবে।

৯. নির্জনা—কৰ্ম বকল ও প্রবাহ থেকে আঘাতে মুক্ত কৰতে হবে।

১০. লোক—বিশ্ব অনাদি কাল থেকে চলে আসছে। এর মধ্যে ছাতি দ্বারা আমাদি

কাল থেকে চলে আসছে।

১১. বৌধিমূল্লি—সম্যগ মূল্লি, জ্ঞান ও সম্যক চারিয় আজৰ্বন কৰ্ম মূল্লি। এর জন্য

সত্ত্বে যত্ন কৰতে হবে।

১২. ধৰ্ম—আমাদের কৰ্ত্তব্য শান্তি ও মুক্তি পাওয়া।

১৩. সতেজোটি সংযম পালন কৰা সাধু ও সাক্ষীদের পক্ষে এক অপরিহৰ্ম অংশ।

এদের বৰ্গীকৰণ ও নাম নীত দেওয়া হলো—

(৪) আবক্ষানিকার পালনীয় ধৰ্মবৰ্ত :

জেন সাধু ও সাক্ষীদের নাম জেন আবক্ষ ও আবক্ষানিক পালন কৰবেন। সে ব্রতগুলো হলো—

১. দ্বিসা, ২. অপস্তা, ৩. চৰৈৰ, ৪. অব্রহাম, ৫. পৰিয়হ।

২. ইঞ্জি আপৰ আগ :—১.শৰ্ম, ২.শৰ্প, ৩. কুশ, ৪.ত্ৰু, ৫. গুড়।

৩. ক্ষমা আগ :—১.ক্ষেম, ২. মন ৩. মায়, ৪. সেৰেত।

৪. ক্ষমা আগ :—১.ক্ষেম, ২. মন ৩. মায়, ৪. সেৰেত।

৫. ক্ষমা আগ :—১.ক্ষেম, ২. মন ৩. মায়, ৪. সেৰেত।

৬. দ্বিসা আপৰ আগ :—১.ক্ষেম, ২. মন ৩. মায়, ৪. সেৰেত।

৭. দ্বিসা আপৰ আগ :—১.ক্ষেম, ২. মন ৩. মায়, ৪. সেৰেত।

৮. দ্বিসা আপৰ আগ :—১.ক্ষেম, ২. মন ৩. মায়, ৪. সেৰেত।

৯. দ্বিসা আপৰ আগ :—১.ক্ষেম, ২. মন ৩. মায়, ৪. সেৰেত।

১০. দ্বিসা আপৰ আগ :—১.ক্ষেম, ২. মন ৩. মায়, ৪. সেৰেত।

১১. দ্বিসা আপৰ আগ :—১.ক্ষেম, ২. মন ৩. মায়, ৪. সেৰেত।

১২. দ্বিসা আপৰ আগ :—১.ক্ষেম, ২. মন ৩. মায়, ৪. সেৰেত।

১৩. দ্বিসা আপৰ আগ :—১.ক্ষেম, ২. মন ৩. মায়, ৪. সেৰেত।

১৪. দ্বিসা আপৰ আগ :—১.ক্ষেম, ২. মন ৩. মায়, ৪. সেৰেত।

১৫. দ্বিসা আপৰ আগ :—১.ক্ষেম, ২. মন ৩. মায়, ৪. সেৰেত।

১৬. দ্বিসা আপৰ আগ :—১.ক্ষেম, ২. মন ৩. মায়, ৪. সেৰেত।

১৭. দ্বিসা আপৰ আগ :—১.ক্ষেম, ২. মন ৩. মায়, ৪. সেৰেত।

১৮. দ্বিসা আপৰ আগ :—১.ক্ষেম, ২. মন ৩. মায়, ৪. সেৰেত।

১৯. দ্বিসা আপৰ আগ :—১.ক্ষেম, ২. মন ৩. মায়, ৪. সেৰেত।

২০. জেন সংবৰ্ধী শৰ্মধৰা কি ?

মৈত্রীর আদর্শসূচক। জৈন পঞ্চ মহারত হলো যোগ সাধনের পাঁচটি যম। মানুষ মাত্রেই অবশ্য পালনীয়। যোগসাধ-পৌদে (৩০) আছে—

তাহিঙ্সা-সতাঙ্গে-ব্রহ্মর্থাগরিয়া যাঃ। ॥

অহিংসা (বেরীভাগত্যাগ), সত্ত (সত্তমনা, সত্ত কথা বলা ও সত্ত কাজ করা), সংযম (বার্মিক, বাচিক ও মানসিক কর্ম দ্বারা তৈরি পরিভ্রান্ত বস্ত্র), ব্রহ্মর্থ (তিপঙ্খেত্রের সংযম) ও অপরিগ্রহ (অতঙ্গ লোড-লেনুপত্তা ও স্বাধীনিতা ত্যাগ করা)—এ পাঁচটি যম মানুষ মাত্রেই অবশ্য পালনীয়।

যাজ্ঞবল্ক্ষণ বলেছে—

ব্রহ্মচর্যং দ্যা ক্ষাতিধীনং সত্তমকর্ত্তা। ॥

অহিংসাস্ত্রে-মাধুর্ম-দ্যমচেতি যমাঃ স্মৃতাঃ। ॥

ব্রহ্মচর্য, দ্যা, ক্ষমা, ধীন, সত্তমকর্ত্তা, নিষ্পাপ অঙ্গঃকরণ, অহিংসা, অপরিগ্রহ না করা এবং ঘূর্ণ ভাব—এগুলোকে যম বলে।

ডীক্ষিত আছে—

আহিংসা সত্তবচনং ব্রহ্মচর্যমকর্ত্তা।
শৌচঃ সত্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বর-প্রতিধান নিয়মাঃ।
করা এবং ঘূর্ণ ভাব—এগুলোকে যম বলে।

নিয়মও পাঁচ প্রকারের—

‘শৌচঃ সত্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বর-প্রতিধান নিয়মাঃ।
শৌচ (পরিত্রুতা), সত্তোষ (সম্বৃক্ত প্রসন্নতা), তপঃ (কষ্টপূর্বক তপস্যা), স্বাধ্য (অধ্যাপনা ও অধ্যাপন), দীর্ঘ অধিধন (দীর্ঘের উপর ভাঙ্গি) — এ পাঁচটি কে নিয়ম বলে।

যাজ্ঞবল্ক্ষণ মতে—

মানং মৌমোগবাসেজ্ঞা স্বাধ্যায়োপস্থিনিয়ঃ। ॥

‘মান, মৌমোগবাসেজ্ঞা স্বাধ্যায়োপস্থিনিয়ঃ।’
শৌচ, ক্রোধ, জয় ও সাধনাতা—এগুলোকে নিয়ম বলা হয়।

কানো মতে পঞ্চ নিয়ম হলো—

অত্রেণেম ঘূর্ণ-শূশ্রা শৌচমাত্যার-লাভবন্ম। ॥

জৈন তথ্য ভারতীয় মতে সাধনমার্গ হলো অতুষ্ঠ কর্তীন। এর জন্য নিরতর কষ্ট ও তপস্যার প্রয়োজন। আস্থাকে বিশুদ্ধ রাখতে হলো উপরিজ্ঞত এসব নিয়ম বা উপনিয়

পালন করা বিধেয়। আজকের দিনও আমাদের সবচেয়ে আবশ্যিক হচ্ছে আগ্নিকীর্ণ ও সাধনা যা আমাদের জীবনের ভিত্তিক সূর্য করে তুলতে পারে। জৈনগণ মন করেন মে নেতৃত্বাত দিক দিয়ে যে সমাজ যত উচ্চতে, সে সমাজ তত উচ্চত।

আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন জৈন সংস্কৃতি তথা ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শ হলো মৈত্রীর আদর্শ।
সর্বত্ত্বে চান্দানং ততো না বিজুপ্লাতে।

সর্বত্ত্বে চান্দানং ততো না বিজুপ্লাতে।
তিক এই ভাবাপন্ন একদিন গ্রোমনোতে বিশাদী হিলন।

‘homo sum, humani nihil a me alienum puto.

‘মানুষ আমি, মানুষ সংজ্ঞাতে এমন কিছু নেই যাকে আমি নিজের থেকে দূরের জিনিস বলে মনে করি।’

ওরু যজ্ঞবেদের (৩৬/১৮) মন্ত্র ভারতীয় তথা জৈন সংস্কৃতিও আদর্শ মন্ত্র :

‘ত্বে দৃঃ মা মিত্রে মা চক্ষু সর্বানি হৃতানি সমীক্ষ্মত্বাত্।

মিত্রস্য চক্ষু সমীক্ষ্মহে।।

‘জো দ্বাৰা শীর্ণ জীৰ্ণ হলো আমাকে দৃঃ কৰ। মিত্রের চক্ষু দ্বাৰা আমিও মেন সকল প্রকার প্রাণীকে দেখি। আমোৱা মেন পৰম্পৰ (দ্বোহর্জিত হয়ে) মিত্রের চক্ষু দ্বাৰা দেখি।’

সংসারে সমস্ত জীবকে মৈত্রীর দৃষ্টিতে দেখতে হবো। মিত্রতা বৰ্ণ কৰাৰ জন্ম প্রগাঢ় বিশ্বাস আৰম্ভক। যখনেন মানুষ অন্য লোকেৰ উপর অবিশ্বাস আচৰণ কৰে থাকে সেখানে মিত্রতা থাকে না। মিত্রতাৰ জন্ম সংঘোচ ও ভয়শূন্য হতে হয়। এজন্ম উপাসক বা সাধক সৰ্বদ নির্ভৰ হিসেবে এই আৰ্থনা কৰবেন—

আভয়ং নং বৰত্যত্রি ক্ষমতায়ং দ্বাৰা পূৰ্ণী উত্তে ইয়ে।

আভয়ং পঞ্চাদত্যং পূৰ্ণস্তুতৰাদবৰ্দ্ধয়ং নো অস্ত।

(অথৰ্ববেদ ১৯ ১৫ ৫)

অত্তীরিক্ষ, দুলোক ও পৃথিবী উভয়েই আমাদের অভয় আশীর্ব প্রদান কৰিন্ন।
পশ্চাত দিক থেকে অভয়, অগদেশ থেকে অভয়, উর্ধ্ব ও অধঃস্থান থেকে অভয় (অধ্যং নির্ভৰতা) তৰা আমাদের প্রদান কৰিন্ন।

অভয়ং মিত্রাদত্যমিত্রাদত্যং জ্ঞাতাদত্যং পৰোক্ষং।

অভয়ং নক্ষত্রাত্মং দিব্য নং সৰ্ব আশা মাম মিত্রং ভবত।

(অথৰ্ববেদ ১৯ ১৫ ৫)

যিন্দ্রের কাছ থেকে অভয়, অমিত্রের কাছ থেকেও অভয়, পরিচিত সকলের কাছ থেকে অভয় এবং পরোক্ষ স্তুতি থেকেও অভয়। রাত্রি থেকে অভয় এবং দিন থেকেও অভয়। এই মৈত্রী সাধনার মূলমূল হলো আহিঃসা। আহিঃসার মাধ্যমেই আত্মদর্শন লাভ হয়। যানোবিজ্ঞেনের দৃষ্টিকোণ থেকে জৈলগন বিচার করে দেখছেন যে আত্মদর্শন লাভ হলো বৃহৎ সাধন। এবং নির্বাণ হলো তার চরণ লক্ষ্য।

নামসমিল্প নাগণ নামেশণ বিগণ গুহ্যতি চরণগুণ।

অঙ্গিমস নথি মৌক্ষিকী নথি অমোবৰ্খণ্স নির্বাণ।।।

“স্মাগৃগুণ ব্যতীত স্মাগ্ জ্ঞান হয় না, স্মাগ্ জ্ঞান ব্যতীত স্মাগু চরিত্রগুণ ক্ষমা অঙ্গের মোক্ষ নেই এবং অমোক্ষের নির্বাণ নেই।।।

জৈলদের বিশ্বাস আহ্বান ও নিষ্ঠা সহস্রে সরল যান্ব জাতি আহিঃসা ধর্ম পালন করলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বিশেষ উন্নতি হবে এবং বিশ্বময় মানবজাতির এক মহন্ম মিজন-সেতু রচনা হবে।

জৈন শব্দর (৪।২০৪) কথায়—

ব্যান্ম সেবেত সতং ন নিতং নিম্নমান বৃং।।।

ব্যান্ম প্রত্যক্ষৰ্বৰ্ণে নিয়মান বেশলান তজন।।।

ব্যান্ম স্বীকীয়মান মানুষ সর্বদা সম্বয়েরই সাধনাক করে থাকেন, কেবল নিয়মের সেবন করেন না। যে শুধু নিয়ম সেবন করে সাধন করেন তার উদ্ধারিত চেয়ে অবন্তি হয়ে থাকে।

২১। জৈন দর্শন সহস্রে সহস্রে একটু বলবেন ?

জৈন দর্শন বিশাল, ব্যাপক ও গভীর। জৈন দর্শন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে হল অভিত্তঃ তিনিটি বিষয় সহস্রে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সে তিনিটি বিষয় হলো—

(গ)

১. নয়বাদ,

(হ)

২. অনেকাত্মবাদ, তত্ত্ববিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞান,

(গ)

৩. সম্পূর্ণসূত্র ও

(হ)

৪. স্বাধাদ।

১. নয়বাদ :
নয় শব্দের অর্থ হলো বিচার। অতএব নয়বাদ মানে ‘বিচারবাদ’। কোনও এক বিষয় বা বস্তুর স্বত্ত্ব বা পর্যায় নিরূপণ কর্মবার জন্য বিশেষ অপেক্ষার সাহিত হোক থেকে অভয় এবং পরোক্ষ স্তুতি থেকেও অভয়, পরিচিত সকলের কাছ থেকেও অভয়। রাত্রি থেকে অভয় এবং দিন থেকেও অভয়। এই মৈত্রী সাধনার মূলমূল হলো আহিঃসা। আহিঃসার মাধ্যমেই আত্মদর্শন লাভ হয়। যানোবিজ্ঞেনের দৃষ্টিকোণ থেকে জৈলগন বিচার করে দেখছেন যে আত্মদর্শন লাভ হলো বৃহৎ সাধন। এবং নির্বাণ হলো তার চরণ লক্ষ্য।

বিষয় বা বস্তুর স্বত্ত্ব বা পর্যায় নিরূপণ কর্মবার জন্য বিশেষ অপেক্ষার সাহিত

বিচার করাকে নয় বলে।।। যে বিভিন্ন দৃষ্টিদীর প্রয়া সাপেক্ষ কিংবা সম্বুদ্ধে যে আপাত বিশেষ দৃষ্টিহ্য সেই বিজ্ঞানের মধ্যে সম্বয়ের মূল অনুসন্ধান করবার শাস্ত্রকে নয়বাদ বলে। (জৈনধর্মের রূপরেখা, পৃঃ ৩৬)

জৈন নয় সাতটি : নেগম, সংঘর্ষ, ব্যবহার, খন্দন্ত, শব্দ, সমভিজ্ঞাত ও এবস্তুত। নেগম নয় বল। যেমন, চৈত্যবন্ম মানুষ একটি জীব। এখানে জীবের সামান্য ও বৈশেষিক দর্শনেতে স্বীকৃত।

সংঘর্ষ নয় : ব্যতীত উপক্ষা করে মুখ্যরাপে তার সামান্য ধর্মকে বীকীর করাকে সংঘর্ষহ্য বল। এই নয়ের ধারা ব্যতীত বিশেষ ধর্মকে সামান্যের মধ্যেই সংগ্রহিত করে বল একে সংঘর্ষ বল। যেমন, জীব অসম্ভব প্রদেশ্যত। প্রত্যেক জীবে তিনি তিনি আশা ধারণেতে সমস্ত জীবের আশা প্রবর্যাপে সামান্য ধর্মে একপ্রকার স্বীকৃত।

ব্যবহার নয় : ব্যতীত সামান্য ধর্মকে উপক্ষা করে মুখ্যরাপে বেশলমাত্র ধর্মকে বীকীর করাকে ব্যবহার নয় বলে। এই নয়ের ধারা সামান্য ধর্মকে বিশেষ ধর্মের মধ্যেই ধরা হয়। যেমন, বিষয় আসন্ন-স্বৃক্ত শৰীরধৰী জীব। এখানে কর্মজ্ঞিনিত বিষয় বাসন হয়ে থাকে।

ব্যবহার নয় : যে নয়ের ধারা অতীত ও ভবিয়ৎ কালকে উপক্ষা করে বেশলমাত্র ব্যতীত কালের পর্যায়বেই বীকীর করা হয়, তাকে ব্যক্তিহ্য নয় বলে। অতীত ও ভবিয়ৎ কালকে না ধরার কারণ হলো এই যে অতীত পর্যায় নিষ্ঠ এবং ভবিয়ৎ পর্যায়ের একান্তে উৎপন্ন হয়নি, অতএব বর্তমানই একমাত্র চির্ম বিষয়। বীকীর দর্শন এই নয়কে স্বীকীর করে।

শব্দ নয় : যে নয়েতে শব্দেরই প্রতিক্রিয়া আধান তাকে শব্দ নয় বলে। শব্দের মধ্যে যে কারণ লিঙ্গ, কাল, উপসর্গ প্রতিক্রিয়া থাকে, তার প্রয়োগের ধারা শব্দের যে বিভিন্ন রূপ হয় এবং সেই রূপের ধারা যে বিভিন্ন অর্থ হয় বা অর্থ বীকীর করা হয়, তাকে শব্দ নয় বলে। যেমন, পাটলিপুত্র নামে এক নগর ছিল। এখানে ছিল শব্দ প্রয়োগ করায় বর্তমান পাটলিপুত্র থেকে যে তা ভিন্ন তা বৈষ্য।

সমভিজ্ঞান নয় : সমভিজ্ঞান নয়ের ধারা একাধৰ্যাচীনান শব্দের ব্যুৎপত্তি তন্ময়ী প্রতিম অর্থ করা হয়। এই নয় শব্দ নয় থেকে আরও শৃঙ্খল বিচার ধরার আচ্চায় নেয় এবং শব্দের রাজ্য অর্থের পরিত্যাক করে তার ব্যুৎপত্তি গত অর্থকে বীকীর করে। যেমন জীব এই হলো এই নয়ের মূল লক্ষ্য।

এবস্তুত নয় : যখন ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুযায়ী কার্য সম্পাদিত হয় তখন তাকে

এবঝত নয় বলে। ইহা সমতিরাত্মক অবস্থা আরও সুস্থিত। যেমন, যিনি রাজা তিনি যতক্ষণ রাজদণ্ড খরণ করে 'রাজা' পদবাচ হবেন, ততক্ষণই তিনি রাজা। অন্য সময় করে পাঁচটি নয় স্থীকার করা হয়েছে। তার মতে এ দুটো নয় শব্দ নয়ের বিশেষ ভেদমাত্র।

২. অনেকাত্মবাদ :

অনেকাত্মবাদ বাদ বলতে বস্তুর স্বরূপ স্বাধীন বিশেষ করে শব্দ নয়ের অঙ্গভূত করে পাঁচটি নয় স্থীকার করা হয়েছে। তার মতে এ দুটো নয় শব্দ নয়ের বিশেষ ভেদমাত্র।

৩. তত্ত্বার্থাদিগম স্বত্রে (১৩৪, ৩৫) সমতিরাত্মক এবঝ তন্ময়কে শব্দ নয়ের অঙ্গভূত করে পাঁচটি নয় স্থীকার করা হয়েছে। তার মতে এ দুটো নয় শব্দ নয়ের বিশেষ ভেদমাত্র।

৪. স্বাধাদ :

অনেকাত্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে শীঘ্র এদের সম্পর্ক দেখান হচ্ছে।

ও প্রতিক্ষানি প্রমাণের বাধাশূন্যকাপে পথক পথক বা সামিলিতভাবে বিধি ও নিয়েদের পর্যন্তে নয়ের বচন বিন্যাস 'স্বাধ' শব্দের ধারা করা হয় বলে এক 'স্বাধাদ' সংগৃহীত বলে। 'স্বাধ' শব্দের অর্থ 'কথিকৰণ' বা 'কেন আপেক্ষায়'। অনেকাত্মবাদের বিচার ধারা এই সংগৃহীত স্বাধাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে শীঘ্র এদের সম্পর্ক দেখান হচ্ছে।

৫. স্বাধাদী নয়ের বচন বিন্যাস 'স্বাধ' শব্দের ধারা করা হয় বলে এক 'স্বাধাদ' সংগৃহীত বচন করে আপেক্ষিকতার সাহিত যে সাত প্রকার বচন বিন্যাস করা হয়, তাকে পর্যন্তে নয়ের বচন বিন্যাস করে আপেক্ষিকতার সাহিত যে সাত প্রকার বচন বিন্যাস করা হয়, তাকে সংগৃহীত করে।

৬. স্বাধাদ :

স্বাধাদী নয়ের বচন বিন্যাস 'স্বাধ' শব্দের ধারা করা হয় বলে এক 'স্বাধাদ' বচনের অর্থ 'কথিকৰণ' বা 'কেন আপেক্ষায়'। অনেকাত্মবাদের বিচার ধারা এই সংগৃহীত স্বাধাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে শীঘ্র এদের সম্পর্ক দেখান হচ্ছে।

স্বাধাদ	সংগৃহীত	সংগৃহীত বচনবিন্যাস	জীবের উপর ধর প্রয়োগ
(১) স্বাধ আঙ্গ	প্রথমো তৎঃ (বিষি) কঞ্জনার ধারা)	স্বাধস্তোর স্বাধিতি সদশ্ম-কঞ্জন- বিজ্ঞানেন প্রথমো তৎঃ। যথা—স্বাধ অঙ্গের ঘটঃ। অর্থাৎ ঘটের আঙ্গের সর্বাঙ্গে বা আংকিকভাবে সত্য।	জীব কোন আপেক্ষায় নিয়ত। অতএব অন্য আপেক্ষায় অনিয়ত হতে পারে।
(২) স্বাধাদি নিয়ে	দ্বিতীয়ো তৎঃ কঞ্জনার ধারা)	স্বাধস্তোর স্বাধিতি পর্যাদাম- কঞ্জন-বিজ্ঞানেন বিত্তোয়ো তৎঃ। যথা—স্বাধস্তোর ঘটঃ। অর্থাৎ ঘটের নাস্তিক সর্বাঙ্গে বা আংকিকভাবে সত্য।	জীব কোন আপেক্ষায় অনিয়ত। অতএব অন্য আপেক্ষায় নিয়ত হতে পারে।
(৩) স্বাধাদি নাস্তিচ	তৃতীয়ো তৎঃ (বিষি ও নিয়ে কঞ্জনার ধারা)	স্বাধস্তোর স্বাধস্তোয়েতি ক্রমেণ সদশ্মসমশ্ম-কঞ্জন-বিজ্ঞানেন তৃতীয়ো তৎঃ। যথা—স্বাধাদি নাস্তিক বিজ্ঞানেন অর্থাৎ ঘটের আঙ্গের ঘটঃ। সর্বাঙ্গে বা আংকিকভাবে সত্য।	জীব কোন আপেক্ষায় নিয়ত বচনে বচনের অন্য কোন আপেক্ষায় অনিয়ত বচনে বচনের অন্য কোন আপেক্ষায় নিয়ত বচনে।
(৪) স্বাধ বচনবিন্যাস	চতুর্থো তৎঃ (যুগপৎ বিষিনিয়ে কঞ্জনার ধারা)	স্বাধস্তোর্যামেবেতি সমসময়ে বিষি- বিজ্ঞানে চতুর্থো তৎঃ। যথা—স্বাধস্তোর্য এব ঘটঃ। অর্থাৎ ঘট সর্বাঙ্গে বা আংকিক- আক্ষিতে বক্ষমাট্টেঃ সংগৃহীত গীয়েতে। 'কোনও এক বস্তুতে অঙ্গিত্বাদি ধর্মের বিষয়ে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হলে বিবোধণে	জীব কোন আপেক্ষায় অব্যক্ত্য জীবের নিয়ত ও অনিয়ত যুগপৎ প্রতিগানন কোন কোন শব্দের অবস্থায় অপরিস্ফুট। অবস্থা সংজ্ঞায়।

ମାଧ୍ୟମେ ଜୈନଗଣ 'ଆନେବାତୋଦ' ହୁଏ ପ୍ରୟାସୀ ହେଯାଇଲୁ । 'ଶ୍ଵରୁ ଶ୍ଵରୀ ଏ ମହାଦେଵ' ପକାଶ କରିବା ହୀ ବଳେ ଏକ 'ସ୍ଥାନଦିତ' ବଳା ହୀ । ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ଥାନଦ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଏହି ପଥ ଥାରଙ୍ଗଲେ ମାନ୍ୟମେହେରେ (୧୨୯୨ ବ୍ରୀଟିଷ୍‌ଟାଙ୍କ) 'ସ୍ଥାନଦମଞ୍ଜଳିରେ ବିଶେଷଭାବେ ଉଦ୍ଘୋଷିତୀର୍ଥ' ।

୨୨ । ଆବର ଶଦ୍ଧେର ଅର୍ଥ କି ? କ୍ୟା ଅକାର ଓ କିକି ?

ଆବର ଶଦ୍ଧେର ଅର୍ଥ ହୀ 'ଜୈନ ଧର୍ମବଳୀ ଶାଖାରଗ ଲୋକ' । ଶଦ୍ଧାରି ବୁଝନ୍ତି ଗତ ଅର୍ଥରେ ଏ କଥାର ଈସିତ ଦେଇ । ଆବର ଶଦ୍ଧାରିକେ ଜୈନ ଟୀକାକରାରଗଣ ନାନାଭାବରେ ଆଖ୍ୟା କରନ୍ତି ।

ପିଲିଘର ଜୋନ ଆଶାର (ସଂଖ୍ୟ ୧୨୩୫-୧୩୦୦୧) ତାର ନାଗାର ମେର୍ମାର୍ଟରେ ଏହି ମେଥ୍ଯୁରୀ ବିଭିନ୍ନ କରେଣ୍ଟ ପାଇଁକ, ନେଟ୍ଟିକ ଓ ସାମକ
ପାଇଁକ :: ଅହିମାର ପତି ଯାର ଶୌକ (ଅର୍ଥାତ୍ ପକ୍ଷ) ଆଜେ ତାର ପାଇଁକ ଆବଶ୍ୟକ
ନେଟ୍ଟିକ :: ଯେ ଯେହି ଜୀବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କହିଛି ଯାତି ମ୍ରିତ ଶାଳା କରୁ, ତାକେ
ଅଧିକ :: ଯେ ଯେହିଙ୍କାଣ ପଞ୍ଜନ କରି ତାର ମନ୍ୟ ଜୀବନର ଆଶାକେ ଶୁଦ୍ଧ କରେ ଜୀବନ
ଅବସାନ (ଶାମାତି ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ) କରୁ, ତାକେ କାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବଲେ।

বর্তমান যুগে এ সকল বিভাজন হয়ত দেখা যায় না, কিন্তু এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল যারা শ্রা঵ক তাদের প্রকৃতিতে এ চার প্রকার অবস্থার উৎপন্ন হতে পারে।

২৩। হিন্দুদের মত জৈনদেরও কি 'চতুরাশ্রম' আছে?

প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুদের মত জৈনদের চতুরাশ্রম পথ নেই। কিন্তু চামুণ্ডারায় (খুব সত্ত্ববতঃ একাদশ সম্বতে জীবিত ছিলেন) তাঁর চারিত্রসার নামক গ্রন্থে হিন্দু প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে 'চতুরাশ্রম' স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে জৈনদের 'চতুরাশ্রম' হল—
১. ব্রহ্মচারিন्, ২. গৃহস্থ, ৩. বাণপ্রস্থ ও ৪. ভিক্ষু। প্রত্যেকটির আবার উপবিভাগ আছে। নীচে চিত্রের সাহায্যে তা দেখান হচ্ছে :

দিগন্বর জৈন চামুণ্ডারায়ের মতে চারটি আশ্রম হল—

১। ব্রহ্মচারিন্	<ol style="list-style-type: none"> ১. উপনয়-ব্রহ্মচারিন্ ২. অবলম্ব-ব্রহ্মচারিন্ ৩. অদীক্ষা-ব্রহ্মচারিন্ ৪. গৃড়-ব্রহ্মচারিন্ ৫. নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারিন্
২। গৃহস্থ	<ol style="list-style-type: none"> ১. জাতি-ক্ষত্রিয় ২. তৌর্থ-ক্ষত্রিয়
৩। বাণপ্রস্থ	পরবর্তী কালে এদেরকে ঐলক শ্রা঵ক বলা হত।
৪। ভিক্ষু	<ol style="list-style-type: none"> ১. অনগার ভিক্ষু ২. যতি ভিক্ষু ৩. মুনি ভিক্ষু ৪. খবি ভিক্ষু

আশাধর (সম্বৎ ১২৩৫-১৩০০ ?) তাঁর সাগার-ধর্মামৃত নামক গ্রন্থে চামুণ্ডারায়ের এই চার প্রকার আশ্রম স্বীকার করেছেন। আসলে ঐতিহাসিকভাবে এই চার আশ্রম পথার উদ্ভব হলেও, সামজিক জীবনে এর প্রভাব খুব বেশী দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় নি।

২৪। সন্নেখনা মানে কি?

সাধারণভাবে সন্নেখনা মানে হল 'ধর্মীয় স্বেচ্ছা মৃত্যু'। জীবনের প্রতি বীতস্পৃহয়ে আহ্বান পরিত্যাগ পূর্বক কষায় নিরশন করে আমৃত্যু যে ব্রত করা হয়, তাকে সন্নেখনা বলে।

২৫। পুদ্গল কাকে বলে?

স্পর্শ-রস-গন্ধ-বর্ণবান् পুদ্গলঃ।

যার স্পর্শ, রস, গন্ধ ও বর্ণ আছে তাকে পুদ্গল (matter) বলে।